POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا اَمٰنٰتِكُمۡ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُونَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত আমানতসমূহেও জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

(সূরা আনফাল: ২৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 9

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 29 Feb, 2024 18 শাবান 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

পশু বন্ধক রাখা

২৫১১) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলতেন- বন্ধক রেখে দেওয়া পশুর উপর এজন্য খরচ করা হয় যাতে সেটিকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয় আর দুগ্ধদানকারী পশুর দুধও কাজে লাগনো হয়।

২৫১২) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- বন্ধক রাখা পশুর সওয়ারী করা উচিত, কেননা তাকে খাওয়ানোর জন্য খরচ করতে হয়। অনুরূপভাবে দুগ্ধদানকারী পশুও যদি বন্ধক থাকে তবে তার দুধ দোহন করা উচিত। কেননা তাকেও খাদ্য খাওয়াতে হয়। আর যে ব্যক্তি পশুর দুধ খায় এবং সওয়ারী করে, সে পশুর খাদ্যের খরচ বহন করবে।

তাহাজ্জদের নামাযের গুরুত্ব

১১৪২) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- 'তোমাদের মধ্য থেকে যখন কেউ ঘুমায়, শয়তান তার গ্রীবার উপর তিনটি বাঁধন দেয়। প্রত্যেকটি বাঁধন শক্ত করে বাঁধে (আর বলে) এখনও অনেক রাত, তুমি ঘুমিয়ে থাক। যদি সে ঘুম থেকে উঠে পড়ে আল্লাহ্ তা'লার তসববীহ ও তামহীদ করে, তবে তার একটি বাঁধন খুলে যায়। যদি ওজু করে তবে আরও একটি বাঁধন খুলে যায়। আর যখন নামায পড়ে তখন তৃতীয় বাঁধনটিও খুলে যায়। এরপর সে সকালে সতেজ এবং খোশমেজাজে থাকে। অন্যথায় অলস এবং বদমেজাজ হয়ে থাকবে।

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খণ্ড)

খোদা তা'লা ব্যতিরেকে জীবন অতিবাহিত করাও এক প্রকার জাহান্নাম।

মানুষ এই সব রোগব্যধি ও বিপদাপদে আক্রান্ত হয় কারণ সে খোদা থেকে দূরে সরে গিয়ে খোদার সামনে ঔদ্ধত্যপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে, সে খোদা তা'লার কথাকে সম্মান দেয় না কিম্বা গ্রাহ্য করে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

দুটি বস্তুর পরস্পরের ঘর্ষণের ফলে উত্তাপ তৈরী হয়। অনুরূপভাবে মানুষের ভালবাসা এবং জগত এবং জগতের বস্তুসমূহের ভালবাসার ঘর্ষণের ফলে ঐশী ভালবাসা পুড়ে যায় এবং হৃদয় অন্ধকার হয়ে খোদা থেকে দূরে সরে যায় এবং যাবতীয় প্রকারের অস্থিরতার শিকার হয়ে যায়। কিন্তু যখন জাগতিক বস্তুর সঙ্গে যে সম্পর্ক থাকে তা খোদারর মধ্যে বিলীন হয়ে একক সম্পর্ক তৈরী হয় এবং এদের ভালবাসা খোদার ভালবাসায় বিলীন হয়ে যায় , সেই সময় পারস্পরিক ঘর্ষণের ফলে গায়রুল্লাহ্‌র ভালবাসা ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং এর স্থানে জ্যোতি পূর্ণ হয়ে যায়। এই অবস্থাতে পৌঁছেই খোদার ভালবাসার তার জন্য গন্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর যেভাবে জীবন ধারণের অনুষঙ্গ রয়েছে ,সেই জীবনের জন্য কেবল খোদারই প্রয়োজন হয়। ভিন্নবাক্যে বলা যায় যে, খোদার মাঝেই তার আনন্দ ও পরিতৃপ্তি। অতঃপর জগত সর্বস্ব ব্যক্তিদের কাছে যদি কোন দুঃখ ও কষ্ট পায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই দুঃখ-কষ্টের মাঝেও সে শান্তি ও স্থবিরতা থেকে ঐশী সুখানুভব লাভ করে যা কোন দুনিয়াদারের দৃষ্টিতে বড় বড় সফল ব্যক্তিদের ভাগ্যে জোটে না।

এর বিপরীতে খোদা তা'লা ও মানুষের মাঝের যে পরিস্থিতি থাকে তা জাহান্নাম। অর্থাৎ খোদা তা'লা ব্যতিরেকে জীবন অতিবাহিত করাও এক প্রকার জাহান্নাম।

এছাড়া হাদীস থেকেও জানা যায় যে, জ্বরও এক প্রকার উত্তাপ বা জাহান্নাম। মানুষ যে নানান প্রকারের রোগব্যাধি ও বিপদাপদে নিপতিত হয় সেটাও জাহান্নামের নিদর্শন। এটা এ কারণে যে, মানুষ যাতে কিছুটা হলেও পরকালের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং এগুলো ঐশী প্রতিদান ও শাস্তির বাস্তবতার বিষয়ে সাক্ষীপ্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয় আর প্রায়শ্চিত্যবাদের মত জঘন্য ধর্মবিশ্বাসের অপনোদন হয়। যেমন কুষ্ঠ রোগীকেই দেখুন, যেখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পচন ধরে এবং এক প্রকার তরল ক্ষরণ হয়। মানুষের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। এটাও এক প্রকারের জাহান্নাম। মানুষ তখন এমন রুগীকে ঘৃণা করে এবং ছেড়ে পালায়। সব থেকে কাছের তার স্ত্রী, সন্তান এমনকি মা-বাবা পর্যন্ত তার থেকে দূরে সরে যায়। অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। আরও অনেক মারাত্মক ব্যধিতে মানুষ আক্রান্ত হয়। অনেকের পেটে পাথর হয়, টিউমার হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, মানুষ এই সব রোগব্যধি ও বিপদাপদে আক্রান্ত হয় কারণ সে খোদা থেকে দূরে সরে গিয়ে খোদার সামনে ঔদ্ধত্যপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে, সে খোদা তা'লার কথাকে সম্মান দেয় না কিম্বা গ্রাহ্য করে না। সেই সময় এক প্রকার জাহান্নাম সৃষ্টি হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০৩-৫০৪)

কুরআন করীমে 'সাআত' শব্দ কেবল পরকালের কিয়ামতের জন্য ব্যবহৃত হয় নি, বরং আম্বিয়াগণের জামাতের উন্নতি এবং তাদের শত্রুদের বিনাশের জন্যও 'সাআত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জের ২-৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

নিঃসন্দেহে এই আয়াতে زَلۡزَلَةَ السَّاعَةِ ব্যবহৃত হয়েছে যাতে আপাত দৃষ্টিতে এই সংশয় তৈরী হতে পারে যে, হয়তো এতে পরকালের সেই শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা কাফেরদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু একথা সঠি নয়। কুরআন করীম অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, 'সাআত' শব্দ কেবল পরকালের কিয়ামতের জন্য ব্যবহৃত হয় নি, বরং আম্বিয়াগণের জামাতের উন্নতি এবং তাদের শত্রুদের বিনাশের জন্যও 'সাআত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হুদায়বিয়া সন্ধির পর মক্কার কুরায়েশরা চুক্তি লঙ্ঘন করে বনু বাকারের সঙ্গে মিলে মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বনু খাযাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করে তাদের বেশ কয়েকজন সদস্যকে হত্যা করল ,তখন বনু খাযাআ গোত্র এই চুক্তিভঙ্গের সংবাদ পৌঁছে দিতে অবিলম্বে চল্লিশজন ব্যক্তিকে দ্রুতগামী উটের উপর সওয়ার করিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে এবং রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট দাবি করেন, তিনি (সা.) যেন পারস্পরিক চুক্তি অনুসারে এখন তাদের হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন আর মক্কার উপর আক্রমণ করেন। এই প্রতিনিধি দলটি মদিনা পৌঁছনোর পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা দিব্যদর্শনের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে মক্কাবাসীদের চুক্তি লঙ্ঘনের সংবাদ দেন। (অবশিষ্ট পরের সংখ্যায়...)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

তাঁর (সা.) পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ঝরছিল। তিনি (সা.) স্বয়ং সেই রক্ত পরিষ্কার করছিলেন আর বলছিলেন, كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوْا نَبِيَّهُمْ وَ كَسَرُوْا رَبَاعِيَتَهٗ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ সেই জাতি কীভাবে সফল হতে পারে যারা তাদের নবীকে আহত করেছে আর তাঁর কর্তন-দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে; অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে আহ্বান করে?

অকস্মাৎ মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন মু'আয এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-র মাঝে দৃশ্যমান হন এবং আমরা তাঁর (সা.) হাঁটার ভঙ্গি দেখে তাঁকে চিনে ফেলি। সে সময় আমাদের আনন্দের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আমরা পরাজিতও হই নি আর আমাদের কোনো ক্ষতিও হয় নি। যখন সব মুসলমান মহানবী (সা.)-কে দেখে চিনতে পারে তখন সবাই মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে পতঙ্গের মতো জড়ো হয়ে যায়।

উহুদের যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.) এর আহত হওয়ার ঘটনা এবং সাহাবাগণের আত্মনিবেদনের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী।

এমনও একটি সময় আসে যখন মহানবী (সা.)-এর পাশে বারোজনও নয়, কেবলমাত্র তিনজন সাহাবী রয়ে যান আর কাফিররা বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এরূপ নাজুক অবস্থায়ও তিনি (সা.) শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়তার সাথে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং নিজের স্থান থেকে সরেন নি।

হযরত তালহা নীচে বসে পড়েন আর মহানবী (সা.) তাঁর পিঠের ওপর পা রেখে পাহাড়ে আরোহণ করেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি সেই সময় মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তালহা নিজের জন্য জান্নাত আবশ্যক করে নিয়েছে।

ফিলিস্তিনের জন্য আমি (বরাবর) দোয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছি। এখন মুসলমানদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিলিস্তিনকে রক্ষা করার কথা চিন্তা করার পরিবর্তে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে। শুনলাম, পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়েগেছে; তারা পরস্পরের ওপর বোমা বর্ষণ করেছে। এখন এমন ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লাই সকল মুসলমান দেশ ও তাদের নেতৃবৃন্দকে বিবেক বুদ্ধি দান করুন। তাদের জন্য দোয়া করুন,আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝার সামর্থ্য দান করেন, তারা যেন এক ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত হয়।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৯ জানুয়ারী , ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১৯ সুলাহ, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত আছে। এ প্রেক্ষিতেই আরও কিছু কথা বর্ণনা করব। বর্ণিত হয়েছিল যে শত্রুরা ঘোষণা করে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের এই যে সংবাদ ছড়িয়েছিল, মুসলমানরা যখন তা শোনে তখন মুসলমানদের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে, যখন ইবনে কামিয়ার ধারণা হলো, সে মহানবী (সা.)-কে শহীদ করে ফেলেছে তখন সে ঘোষণা করে দেয়, মুহাম্মদ (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। আর এটিও বলা হয় যে, ঘোষণাকারী ছিল শয়তান, যে জুআল অথবা জুআয়েল বিন সুরাকা রূপে ছিল।

জুআল প্রারম্ভিক সৎ মুসলমানদের একজন ছিলেন এবং সুফ্ফাবাসীদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার নাম মহানবী (সা.) পরিখার যুদ্ধের সময় পরিবর্তন করে উমর রেখেছিলেন। যাহোক একথা শুনে মানুষ হত্যা করার উদ্দেশ্যে জুআল-এর দিকে ছুটে যায়। কিন্তু তিনি এই ঘোষণার কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমি তো কোনো ঘোষণা করি নি। খাবাত বিন জুবায়ের এবং আবু বারদাহ্ সাক্ষ্য দেন, যখন এই ঘোষণা হয়েছে তখন তিনি তার কাছে এবং পাশেই যুদ্ধ করছিলেন। অর্থাৎ তিনি এই সাক্ষ্য দেন যে, তিনি তো আমার সাথেই লড়াইরত ছিলেন; অর্থাৎ আমার সাথি হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, এই ঘোষণাকারী আযাব্বুল আকাবা ছিল যে তিনবার ঘোষণা করেছে যে, মুহাম্মদ (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। এই ঘোষণা কে করেছিল, সে সম্পর্কে বেশ কয়েকটি উক্তি রয়েছে। হতে পারে, বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখেছে আর বিভিন্ন মানুষ (ঘে ষণা) করে থাকবে। অর্থাৎ ইবনে কামিয়া, ইবলীস এবং আযাব্বুল আকাবা'র মধ্য থেকে সবাই ঘোষণা করে থাকবে। যে কোনো শয়তানী প্রকৃতির মানুষই এই ঘোষণা করতে পারে।

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই মুসলমানদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলে, এখন যেহেতু আল্লাহ্র রসূল (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন তাই তোমরা নিজেদের জাতির কাছে ফিরে চল, তারা তোমাদের নিরাপত্তা দেবে। এ কথা শুনে অন্য কয়েকজন বলেন, যদি আল্লাহ্র রসূল (সা.) শহীদ হয়ে থাকেন তাহলে তোমরা কি শহীদ হয়ে নিজেদের প্রভুর কাছে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের নবী (সা.)-এর ধর্ম এবং তাঁর বাণীর জন্য যুদ্ধ করবে না?

হযরত সাবেত বিন দাহদাহ্ আনসারদের বলেন, হে আনসারদের দল! মুহাম্মদ (সা.) শহীদ হয়ে গেলেও আল্লাহ্ তা'লা চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই! অতএব নিজ ধর্মের জন্য যুদ্ধ করো। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের বিজয় ও সফলতা দান করবেন।

একথা শুনে আনসারী মুসলমানদের একটি দল দণ্ডায়মান হয় আর তারা হযরত সাবেত-এর সঙ্গী হয়ে মুশরিকদের সেই দলের ওপর হাল্লাকরে যাতে খালিদ বিন ওয়ালীদ, ইকরামা বিন আবু জাহল আর আমর বিন আস এবং যিরার বিন খাত্তাব ছিলেন। মুসলমানদের এই ছোট্ট দলটিকে আক্রমণ করতে দেখে খালিদ বিন ওয়ালীদ তাদের ওপর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ করেন আর সাবেত বিন দাহদাহ্ এবং তার আনসারী সঙ্গীদের শহীদ করেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৯-৪৯০)

এই বিশৃঙ্খল অবস্থা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্ নবীঈন(সা.) পুস্ত কে যা লিখেছেন তা এরূপ, তখন মুসলমানরা তিনভাগে বিভক্ত ছিল। একটি দল ছিল তাদের যারা মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই দলটি ছিল সবচেয়ে ছোটো। তাদের মাঝে হযরত উসমান বিন আফ্ফানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যেমনটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, তখনকার বিশেষ পরিস্থিতি আর তাদের আন্তরিক ঈমান ও নিষ্ঠাকে দৃষ্টিপটে রেখে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের মাঝে কতক মদীনা ফিরে যান আর এভাবে মদীনায়ও মহানবী (সা.)-এর কল্পিত শাহাদত এবং ইসলামী সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে যায়। যার ফলে পুরো শহরে এক প্রকার হৈচৈ শুরু হয়ে যায় এবং মুসলমান আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় শহর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং উহুদের দিকে রওয়ানা দেয়। আর (তাদের মাঝে) কতক তো দ্রুতবেগে দৌড়াতে দৌড়াতে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যায় এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শত্রুদের সারিতে প্রবেশ করে; অর্থাৎ তারা যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয়। দ্বিতীয় দলে ছিল তারা যারা না পালালেও মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ শুনে হয় মনোবল হারিয়ে বসেছে অথবা তখন আর লড়াই করাকে অনর্থক মনে করছিল। এ কারণে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এক দিকে সরে গিয়ে মাথা হতোদ্যম হয়ে বসে পড়েছিল। তৃতীয় দল ছিল তারা যারা অনবরত যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। তাদের মাঝে কিছু এমন লোক ছিল যারা মহানবী (সা.)-এর আশেপাশে সমবেত ছিল আর আত্মবিলীনতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিল। আর অধিকাংশ ছিল তারা যারা রণক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে লড়াই করছিল।

তারা এবং দ্বিতীয় দলের লোকেরা যতই মহানবী (সা.)-এর জীবিত থাকার সংবাদ পেতে থাকে ততই তারা উন্মাদপ্রায় লড়াই করতে করতে তাঁর (সা.) চারপাশে একত্রিত হতে থাকে।

সে সময় যুদ্ধের অবস্থা এরূপ ছিল যে, কুরাইশ সৈন্যবাহিনী যেন সমুদ্রের ভয়াল ঢেউয়ের ন্যায় চতুর্দি ক থেকে ধেয়ে আসছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সবদিক থেকে তির এবং পাথর বর্ষি ত হচ্ছিল। নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীরা এ বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখে মহানবী (সা.)-এর চতুর্দি কে বেষ্টনি গড়ে তাঁর পবিত্র দেহকে নিজেদের দেহ দ্বারা আড়াল করেন। কিন্তু এর পরও যখনই আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতো তখন এই গুটিকতক ব্যক্তিকে এদিক-সেদিক বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। এমতাবস্থায় কখনো কখনো মহানবী (সা.) প্রায় একাই থেকে যেতেন। এমনই কোনো এক সময়ে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস-এর মুশরিক ভাই উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস-এর একটি পাথর তাঁর (সা.) পবিত্র চেহারায় লাগে যার ফলে তাঁর একটি পবিত্র দাঁত ভেঙে যায় এবং ঠোঁটও ক্ষতবিক্ষত হয়। কিছুক্ষণ পরই আরেকটি পাথর, যা আব্দুল্লাহ্ বিন শিহাব নিক্ষেপ করেছিল, তাঁর (সা.) কপালে আঘাত হানে। আরও কিছুক্ষণ পর তৃতীয় একটি পাথর, যা ইবনে কামিয়া নিক্ষেপ করেছিল, তাঁর (সা.) পবিত্র গালে এসে আঘাত করে যার ফলে তাঁর শিরস্ত্রাণের দুটি আংটা তাঁর গালে বিদ্ধ হয়ে যায়। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তার ভাই উতবার এ কাজের ফলে এতটা রাগান্বিত হয়েছিলেন যে, তিনি বলতেন, কখনো কোনো শত্রুকে হত্যার জন্য আমি এতটা উত্তেজনা বোধ করি নি যতটা আমি উহুদের দিন উতবাকে হত্যা করার জন্য উত্তেজিত ছিলাম।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৯৩-৪৯৪)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দোয়া গৃহীত হওয়ার দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বিস্তারিতভাবে উহুদের এ ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

আমি যে একথা বলেছি যে, ইংরেজ জাতি যদি প্রকৃত অর্থে একত্ববাদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমার কাছে দোয়ার আবেদন করে তাহলে তারা বিজয়ী হবে। (এটি ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ের কথা।) তিনি বলেন, যদি তারা আমার কাছে দোয়ার আবেদন করে তাহলে তারা বিজয়ী হবে। এটি খোদা তা'লার বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর কিতাব এবং আমার বিভিন্ন স্বপ্নের সাথে একান্ত সামঞ্জস্য রাখে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ জাতির জন্য অনেক দোয়া করেছেন। কিন্তু এসব লোক খোদা তা'লার আসনে এক বান্দাকে বসিয়েছে। তাই খোদা তা'লা তাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করছেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-কে তারা খোদার পুত্র বানিয়ে রেখেছে, তাই তারা পরীক্ষায় নিপতিত। তাদের জন্য অনেক দোয়া করা হয়েছে। অতঃপর তিনি লাহোরীদের কথা উল্লেখ করেন যে, লাহোরীরা অস্বীকার করতে চাইলে নির্দ্বিধায় করুক; {অর্থাৎ লাহোরীদের দৃষ্টিভঙ্গি তার চেয়ে ভিন্ন যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণ না করছেন।} যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের সম্পর্কে যেসব দোয়া করেছেন তা গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তাদের শির্ক। যদি এই প্রতিবন্ধকতা আংশিক কিংবা পুরোপুরি দূর হয়ে যায় তাহলে এসব দোয়া তৎক্ষণাৎ গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করবে। আমি এমন অনেক স্বপ্ন দেখেছি যে, আমার দোয়ায় তাদের বিপদাপদ দূর হতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমি যে দোয়াই করি তা অবশ্যই গৃহীত হয়। এ বিষয়টি যদি আমার আয়ত্বে থাকতো তাহলে আমি সেসব কষ্টক্লে শ অবশ্যই এড়াতে পারতাম যার সম্মুখীন আমরা হই। পবিত্র কুরআনে আছে, কাফিররা মহানবী (সা.)-কে বলত, তুমি যদি খোদা তা'লার এতই প্রিয় হয়ে থাকো তাহলে তোমার অমুক কাজ কেন হয়ে যায় না? কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! (তুমি) তাদেরকে বলে দাও, যদি আমার নিয়ন্ত্রণে থাকত তাহলে আমি কি প্রভূত কল্যাণ আমার নিজের জন্যই একত্র করে নিতাম না?

অতএব, মহানবী (সা.)-এর জন্যই যদি তাঁর সকল দোয়া কবুল হওয়ার বিধান না থাকেতাহলে আমার বেলায় কীভাবে হতে পারে? মহানবী (সা.)-এর জন্যও যেখানে বিধান এটিই ছিল যে, খোদা তা'লা যদি দোয়া গ্রহণ করতে চাইতেন আর কোনো নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন কেবল তবেই সেই (দোয়া) অবশ্যই কবুল করতেন- সেখানে আমার জন্য কিংবা অন্য কারও বেলায় এর বিপরীতটি কীভাবে সত্য হতে পারে? আমি স্বীকার করছি, ইংরেজদের ক্ষমতা আছে; তারা চাইলে আমাদেরকে ফাঁসি দিতে পারে অথবা বন্দিও করতে পারে। অথচ তখন শত্রুর মোকাবিলায় তাদেরকে দুর্বল মনে হচ্ছিল। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের অবস্থা শোচনীয়ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমার দাবি হলো, আমার দোয়ার কল্যাণে তাদের সমস্যাবলি দূরীভূত হতে পারে। কেননা, আমাদের প্রাণের ওপর ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ অন্য নিয়মের অধীনে আর এ সম্পর্কে দোয়ার গ্রহণীয়তা অন্য আরেকটি বিধানের অধীন। ইরানের বাদশাহ্ মহানবী (সা.)-কে বন্দি করার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু তখনও আটককারীরা আসে নি; শুধুমাত্র বার্তা নিয়ে ইয়েমেনের গভর্নরের দূত এসেছিল। কিন্তু তিনি (সা.) তাকে বলেন, যাও, গিয়ে তোমার মনিবকে বলে দাও- আমরা আসব না। তোমাদের খোদাকে আমাদের খোদা হত্যা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সেই বাদশাহ্‌র পুত্রের মাঝে প্রেরণা সঞ্চার করেন ফলে সে তার পিতাকে হত্যা করে। কিন্তু উহুদের যুদ্ধে শত্রুরা তাঁর ওপর আক্রমণ করে, পাথর নিক্ষেপ করে, তাঁর দাঁত ভেঙ্গে যায়, মাথা ক্ষতবিক্ষত হয় এবং শিরস্ত্রাণের আংটা মাথার মধ্যে ঢুকে যায়, তিনি (সা.) অচেতন হয়ে পড়ে যান এবং তাঁর ওপরে আরো কয়েকজন সাহাবী এসে পড়েন আর সাহাবীরা ধরে নেন, তিনি (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন।

এখন কেউ যদি বলে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সম্মান রক্ষায় এতটা আত্মভিমানী ছিলেন যে, তাঁর খাতিরে এত দূরে ইরানের বাদশাহ্‌কে হত্যা করিয়েছেন! কিন্তু প্রশ্ন হলো, উহুদের প্রান্তরে কাফিরদেরকে কেন তাঁর ওপর এভাবে পাথর নিক্ষেপ করার সুযোগ দিলেন? স্মরণ রাখা উচিত, এসব আপত্তি যথার্থ নয়। এগুলো আল্লাহ্ তা'লার সার্বজনীন প্রজ্ঞা ও পরিস্থিতির যথার্থতার নিরিখে হয়। এ হলো রহস্য। কোনো কোনো সময়ে তিনি তুচ্ছ বিষয়ে পাকড়াও করেন আবার কখনো কখনো কোনো পরিকল্পনার অধীনে অবকাশ দেন, যেন মানুষের সীমাবদ্ধতা এবং অসহায়ত্ব প্রকাশ পায়।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২১, পৃ: ২২৭-২২৯)

ঘটনার বিবরণ অব্যাহত আছে। হত্যার গুজবের পর পুনরায় সাহাবীদের মহানবী (সা.)-এর দর্শন লাভেরও সুযোগ হয়। এর বিশদ বিবরণে লেখা আছে যে, হযরত আবু উবায়দা (রা.) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তখন সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-কে এমর্মে শনাক্ত করতে পারেন যে, তিনি বেঁচে আছেন।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে তাঁর চোখ দেখে চিনতে পারি, যা শিরস্ত্রাণের নীচ দিয়ে উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় প্রতিভাত হচ্ছিল।

[শিরস্ত্রাণ হচ্ছে সেই আবরণী যা যুদ্ধের সময় সৈন্যরা মাথা ও মুখমণ্ডলের সুরক্ষার জন্য পরিধান করে।] যাহোক, তিনি বলেন, চক্ষুদ্বয়ে আমি আকর্ষণীয় ঔজ্জ্বল্য এবং আলো দেখতে পাচ্ছিলাম (আর) আমি বুঝতে পারি যে, মহানবী (সা.) জীবিত আছেন। মোটকথা, আমি তাঁকে চেনামাত্রই পুরো শক্তি দিয়ে চিৎকার করি যে, হে মুসলমানগণ! সুসংবাদ! সুসংবাদ! মহানবী (সা.) জীবিত আছেন। তখন মহানবী (সা.) আমার প্রতি ইঙ্গিত করে আমাকে নীরব থাকতে বলেন। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২০)

অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আরেকজন সাহাবী ছিলেন যিনি সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-কে সনাক্ত করেছেন। যেমন, একজন লেখক লিখেছে, গর্তে পড়ে যাবার পর মহানবী (সা.)-এর সমস্ত পবিত্র দেহ রক্তে রঞ্জিত ছিল। তিনি (সা.) বের হয়ে আসার পর হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.) শিরস্ত্রাণের মধ্য দিয়েই তাঁর (সা.) নয়নযুগল দেখে তাঁকে চিনে ফেলেন এবং আনন্দে চিৎকার শুরু অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ! আনন্দিত হও, ইনি হচ্ছেন মহানবী (সা.)। তখন মহানবী (সা.) তাঁকে ইঙ্গিতে নীরব থাকতে বলেন। কিন্তু মুসলমানরা যতই তাঁর (সা.) জীবিত থাকার বিষয়ে অবগত হতে থাকে ততই তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে ছুটে আসে।

তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.), হযরত আলী বিন আবি তালেব (রা.), হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.), হযরত হারেস বিন সিম্মা (রা.) এবং অন্যান্য মুসলমানও ছিলেন। তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে নিয়ে উহুদ পাহাড়ের একটি গিরিপথে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পথিমধ্যে শত্রুরা যতই আক্রমণ করেমহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ তাদেরকে সমুচিত উত্তর প্রদান করেন।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), ৬ষ্ঠ, খণ্ড-পৃ: ৫৩৭]

কোনো কোনো পুস্তকে রয়েছে, যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাওয়ার কারণে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও অবর্ণনীয় হয়ে পড়েছিল।

অকস্মাৎ মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন মু'আয এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-র মাঝে দৃশ্যমান হন এবং আমরা তাঁর (সা.) হাঁটার ভঙ্গি দেখে তাঁকে চিনে ফেলি। সে সময় আমাদের আনন্দের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আমরা পরাজিতও হই নি আর আমাদের কোনো ক্ষতিও হয় নি। যখন সব মুসলমান মহানবী (সা.)-কে দেখে চিনতে পারে তখন সবাই মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে পতঙ্গের মতো জড়ো হয়ে যায়। তিনি (সা.) তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে একটি গিরিপথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সে সময় তাঁর (সা.) সাথে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) এবং হযরত হারেস বিন সিম্মা (রা.) ছিলেন।

(সিরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, মুসলমানদের জন্য এই আক্রমণ যেহেতু একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল তাই তারা গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকার কারণে শত্রুদের মোকাবিলা করতে পারে নি। রণক্ষেত্রে কাফিররা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং অধিকাংশ সাহাবী হতচকিত ও উদ্বিগ্ন অবস্থায় মদীনা অভিমুখে ছুটতে থাকে। এমন একটি সময়ও আসে যখন মহানবী (সা.)-এর পাশে কেবলমাত্র বারোজন সাহাবী অবশিষ্ট থাকেন। আর এমনও একটি সময় আসে যখন মহানবী (সা.)-এর পাশে বারোজনও নয়, কেবলমাত্র তিনজন সাহাবী রয়ে যান আর কাফিররা বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এরূপ নাজুক অবস্থায়ও তিনি (সা.) শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়তার সাথে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং নিজের স্থান থেকে সরেন নি।

অবশেষে শত্রুরা হঠাৎ করে প্রচণ্ড আক্রমণ রচনা করে এবং সেই কয়েকজন সাহাবীকেও পিছু হটিয়ে দেওয়া হয় এবং মহানবী (সা.) আহত হয়ে একটি গর্তে পড়ে যান। তাঁর (সা.) ওপর কয়েকজন সাহাবীও (যারা তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন,) শহীদ হয়ে পড়ে যান এবং এভাবে কিছু সময়ের জন্য মহানবী (সা.) সাহাবীদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যান। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। এই সংবাদ সাহাবীদের জন্য মহা উদ্বেগের কারণ হয় এবং তাদের অবশিষ্ট মনোবলও হারিয়ে যেতে থাকে। যেসব সাহাবী (রা.) সে সময় তাঁর (সা.) পাশে উপস্থিত ছিলেন এবং জীবিত ছিলেন, তারা লাশ সরিয়ে মহানবী (সা.)-কে গর্ত থেকে তুলে আনেন এবং নিরাপত্তার জন্য তাঁর (সা.) চতুর্দি কে দণ্ডায়মান হন।"(তফসীর কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৭৭০

মহানবী (সা.) যখন মুশরিক সেনা বেষ্টনি থেকে বের হয়ে নিজ আত্মত্যাগী সাথিদের নিয়েপাহাড়ের গিরিপথের দিকে যাচ্ছিলেন তখন উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগীরা একটি সাদা-কালো ঘোড়ায় চড়ে মহানবী (সা.)-এর দিকে অগ্রসর হয়। সে আপাদমস্তক বর্ম পরিহিত ছিল এবং সেই গিরিপথের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল যেদিকে মহানবী (সা.) যাচ্ছিলেন। সে বলছিল , হয় সে জীবিত থাকবে নতুবা আমি! মহানবী (সা.) তার কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েন। তখন উসমানের ঘোড়া সেখানে খুঁড়ে রাখা গর্তগুলোর মধ্য থেকে একটি গর্তে হোঁচট খায় এবং সে সেই গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। তখন হযরত হারেস (রা.) তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ তারা উভয়ে একে অন্যের ওপর তরবারির আঘাত হানে। হঠাৎই হযরত হারেস বিন সিম্মা (রা.) তার পায়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করেন। উসমান সেই আঘাতে একেবারে বসে পড়ে। তখন হযরত হারেস (রা.) তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেন আর তার বর্ম এবং শিরস্ত্রাণ খুলে নেন। মহানবী (সা.) এটি দেখে বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি তাকে ধ্বংস করেছেন। তখনই উবায়দুল্লাহ্ বিন জাবের আমরী হযরত হারেস (রা.)-র ওপর আক্রমণ করে এবং তাঁর কপালে আঘাত করে তাঁকে আহত করে। হযরত হারেস (রা.)-র সাথি তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যান। তৎক্ষণাৎ হযরত আবু দুজানা আনসারী (রা.) দ্রুত উবায়দুল্লাহ্র ওপর চড়াও হন এবং তাকে হত্যা করে মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসেন।

(সিরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২১)

মক্কার এক নেতা উবাই বিন খালাফও মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করেছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহানবী (সা.) যখন গিরিপথের দিকে যাচ্ছিলেন তখন উবাই বিন খালাফ সেদিকে চলে আসে। উবাই বিন খালাফ বদরের যুদ্ধে ফিদিয়ার বিনিময়ে মুক্ত হয়েছিল। সে বলে, আমার কাছে অউদ ঘোড়া আছে যেটিকে আমি প্রতিদিন এক 'ফারক' তথা সাড়ে সাত কিলো ভুট্টা খাওয়াই। এটি খুব শক্তিশালী এবং খুবই সু স্বাস্থ্যের অধিকারী। আমি এটিতে চড়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করব। মহানবী (সা.)-এর কানে তার এই কথা পৌঁছামাত্র তিনি (সা.) বলেন, না, বরং আমি তাকে হত্যা করব। এক ভাষ্যানুসারে সে হিজরতের পূর্বে পবিত্র মক্কা নগরীতে মহানবী (সা.)-কে একথা বলেছিল। মোটকথা উহুদের যু দ্ধের সময় হুযূর (সা.) নিজ সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমার আশংকা হলো, উবাই বিন খালাফ আমার পেছন দিক থেকে আমার ওপর আক্রমণ করবে। তোমরা তাকে দেখতেই আমাকে জানাবে। সে বর্ম পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া নাচিয়ে আসছিল। মহানবী (সা.)-ও তাকে দেখে ফেলেন। সে বলছিল, মুহাম্মদ (সা.) কোথায়? যদি সে বেঁচে যায় তাহলে আমার রক্ষা নেই। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ান। তিনি (রা.) তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিলেন। [অর্থাৎ মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-কে সুরক্ষা করছিলেন]। সে মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে শহীদ করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! উবাই আপনার দিকে অগ্র সর হচ্ছে। আপনি চাইলে আমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন তার ভবলীলা সাঙ্গ করতে পারে। অপর রেওয়ায়েত অনুসারে, সাবায়ে কেরাম (রা.) তার সামনে এসে দাঁড়ান। তিনি (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও, তার পথ থেকে সরে যাও। সে যখন তাঁর (সা.) নিকটবতী হয় তখন তিনি (সা.) বললেন, হে মিথ্যাবাদী! কোথায় পালাচ্ছিস? মহানবী (সা.) হযরত হারেসা বিন সিম্মা (রা.)-র কাছ থেকে বর্শা নেন। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-র কাছ থেকে বর্শা নেন। মহানবী (সা.) গা-ঝাড়া দিলেন আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর (সা.) কাছ থেকে এমনভাবে ছিটকে গেলেন যেভাবে উটের কোমর থেকে মাছি ছিটকে পড়ে। তিনি (সা.) উবাইএর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং তার ঘাড় বরাবর বর্শা নিক্ষেপ করলেন অথবা শিরস্ত্রাণ এবং বর্মে র মাঝ বরাবর দৃশ্যমান স্থানে বর্শা নিক্ষেপ করলেন, যার ফলে সে তার ঘোড়া থেকে কয়েকবার ডিগবাজি খেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। সে ষাঁড়ের ন্যায় গর্জন করতে থাকে। তার ঘাড়ে সামান্য আঁচড় লাগে, তার রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে যায় অথবা তার পাঁজরের কোনো একটি হাড় ভেঙে যায়। সে তার নিজের লোকদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে আর বলে, খোদার কসম! আমাকে মুহাম্মদ (সা.) মেরে ফেলেছে। তার জাতির লোকেরা তাকে বলল, তোমার মনোবল হারিয়ে গেছে। খোদার কসম, তোমার তেমন কিছুই হয় নি!এটি একটি সামান্য আঁচড় মাত্র; এমন আঘাত যদি আমাদের কারো চোখেও লাগতো তবুও তার কিছুই হতো না। সে বললো, আমি লাত এবং উয্ যার কসম খেয়ে বলছি, যে আঘাত আমি পেয়েছি তা যদি আহলে যুল-মাজায অথবা রাবিয়া ও মুযার গোত্রের ওপর লাগত তাহলে তারা সবাই মারা যেত। সেঅর্থাৎ মুহাম্মদ আমাকে মক্কা মুকাররমায় বলেছিল, 'আমি তোমাকে হত্যা করব'।

খোদার কসম! মুহাম্মদ যদি আমার ওপর থুথুও ফেলত আমি মরে যেতাম। মুশরিকরা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন সে সারেফ নামক স্থানে মৃত্যু বরণ করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। সারেফ একটি বড়ো উপত্যকা যেটিকে বর্তমানে নওয়ারিয়াহ বলা হয়। বিদায় হজ্জের সময় মদীনা থেকে যাত্রাপথে এটি মহানবী (সা.)-এর সপ্তম মঞ্জিল ছিল যা তানঈমের নিকটবর্তী অর্থাৎ মক্কা থেকে নয় বা দশ মাইলের দূরত্বে অবস্থিত।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০৮) (সীরাত এনসাক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৭৪) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ :১৪৭)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, 'কু রাইশরা যখন কিছুটা পিছু হটে এবং যুদ্ধের প্রান্ত রে যে মুসলমানরা উপস্থিত ছিল তারা মহানবী (সা.)-কে চিনতে পেরে তাঁর (সা.) চারপাশে একত্রিত হয়, তখন তিনি (সা.) ঐ সাহাবীদের সাথে ধীরে ধীরে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে একটি সুরক্ষিত গিরিখাদে আশ্রয় নেন। পথিমধ্যে মক্কার এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উবাই বিন খালাফ-এর দৃষ্টি রসূলে করীম (সা.)-এর ওপর পড়ে, তখন সে বিদ্বেষ ও শত্রুতায় অন্ধ হয়ে এই বাক্য উচ্চারণ করতে করতে করতে দৌড়ে আসছিল যে 'লা নাজাওতু ইন নাজা' অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) যদি বেঁচে যায় তাহলে তো আমি বাঁচবো না! সাহাবীগণ তাকে আটকাতে চাইলেন কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে বললেন,'তাকে ছেড়ে দাও আর আমার কাছে আসতে দাও'। যখন সে তাঁর (সা.)-এর ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে তাঁর (সা.) নিকটে আসল তখন হুযূ র (সা.) একটি বর্শা নিয়ে তার ওপর আঘাত করলেন আর সেই আঘাতে সে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে

গেল। এরপর মাটি থেকে উঠে চিৎকার করতে করতে পালাতে লাগল এবং বাহ্যত খুব বড়ো আঘাত না হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই সে মারা যায়।" (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯৭)

মহানবী (সা.) তাঁর সাথিদের নিয়ে গিরিপথে পৌঁছলেন। এ সম্পর্কে ইবনে ইসহাকের ভাষ্য হলো, মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের ঘোষণা এবং কিছু লোকের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সর্বপ্র থম মহানবী (সা.)-এর ওপর হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.)-র দৃষ্টি পড়ে। তিনি বর্ণনা করেন যে,শিরস্ত্রাণের ভিতর থেকে মহানবী (সা.)-এর উজ্জ্বল নয়নযুগল দেখতে পেয়ে আমি উচ্চস্বরে বলতে লাগলাম 'হে মুসলমানরা, তোমরা আনন্দিত হও! এই যে এখানে মহানবী (সা.)। আমার কথা শুনে রসূলু ল্লাহ্ (সা.) আমাকে হাতের ইশারায় চুপ থাকার নির্দেশ দিলেন।

যখন মুসলমানরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে চিনতে পারল তখন তারা মহানবী (সা.)-কে সাথে নিয়ে একটি গিরিপথের দিকে রওয়ানা হলো। তাঁর (সা.) সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম ও হযরত হারেস বিন সিম্মা (রা.) উপস্থিত ছিলেন। মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের সাথে সেই গিরিপথে অবস্থান করছিলেন তখন হঠাৎ করে কুরাইশের একটি দল সেই পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে যায় আর কুরাইশদের সেই দলে খালিদ বিন ওয়ালীদও ছিলেন। রসূ লে করীম (সা.) শত্রুদের ওপরে দেখতে পেয়ে এই দোয়া করলেন: اَللّٰهُمَّ إِنَّهٗ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْلُوْنَا. اَللّٰهُمَّ لَا قُوَّةَ لَنَا إِلَّا بِكَ হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর তাদের বিজয় লাভ করা সঙ্গত নয়। হে আল্লাহ্, তুমি ব্যতীত আমাদের কোনো শক্তি-সামর্থ্য নাই।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই হযরত উমর (রা.) মুহাজিরদের একটি দল নিয়ে সেই কাফির দলের মোকাবিলা করেন এবং তাদেরকে পিছু হটতে ও পাহাড় থেকে নীচে নামতে বাধ্য করেন।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৩) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১০)

সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে:মহানবী (সা.) যখন গিরিপথে পৌঁছালেন, তখন কুরাইশের একটি দল খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে পাহাড়ে উঠে আক্রমণোদ্যত হয়। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত উমর (রা.) কতিপয় মুহাজিরকে সঙ্গে নিয়ে তার মোকাবেলা করেন এবং তাকে পিছু হটিয়ে দেন।

(সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃ: ৪৯৭)

এই যুদ্ধের ঘটনার একটি রেওয়ায়েত ইতিহাসে এভাবে পাওয়া যায়, হযরত যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদের দিন দুটি বর্ম পরিধান করেছিলেন।

তিনি (সা.) পাহাড়ের ওপর আরোহণের চেষ্টা করেন, কিন্তু বর্মের ওজনের কারণে এবং মাথা ও চেহারার ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণের কারণে তিনি (সা.) দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, ফলে সেই পাহাড়ে উঠতে পারেন নি। হযরত তালহা নীচে বসে পড়েন আর মহানবী (সা.) তাঁর পিঠের ওপর পা রেখে পাহাড়ে আরোহণ করেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি সেই সময় মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তালহা নিজের জন্য জান্নাত আবশ্যক করে নিয়েছে।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৫)

আরেক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) পাহাড়ের গিরিপথে থাকা অবস্থায় পাহাড়ের ওপরে ওঠার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি (সা.) যখন পাহাড়ে উঠতে যান তখন মাথার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরার কারণে এবং দুর্বলতার কারণে ওঠার শক্তি পান নি। এছাড়া তাঁর শরীরে দুটি বর্মে র বোঝা ছিল। এটি দেখে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ দ্রুত তাঁর সামনে বসে পড়েন এবং তাঁকে কাঁধে বসিয়ে পাহাড়ে তুলে দেন। তখনই তিনি (সা.) বলেন, তালহার এই পুণ্যকর্মের ফলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় ভাগ, ১ম অধ্যায়, পৃ:১৮১)

যেভাবে পূর্বে বর্ণি ত হয়েছে, এই যুদ্ধেই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দাঁত শহীদ হয়েছিল। তখনকার যে চিত্র হযরত আবু বকর অংকন করেছেন সে অনুযায়ী হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন,হযরত আবু বকর (রা.) যখন উহুদের দিনের স্মৃতিচারণ করতেন তখন বলতেন, সেই দিন পুরোটাই ছিল হযরত তালহার (রা.)। তারপর তিনি বিস্তারিত বিবরণে বলতেন, আমিও তাদের মাঝে একজন ছিলাম যারা উহুদের দিন মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে এসেছিল। আমি দেখি, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর নিরাপত্তা বিধানের জন্য যুদ্ধ করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হলো, [অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) বলেন যে, তিনি তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিলেন।] হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, তিনি যেন তালহা হন। যে সুযোগ আমার হাতছাড়া হয়েছে তা তো হয়েছেই; আমি মনে মনে বলি, আমার জাতির কোনো এক ব্যক্তি এই কাজ করার সুযোগ পেলে তা আমার জন্য অধিক আনন্দের কারণ হবে। তিনি বলেন, আমার এবং মহানবী (সা.)-এর মাঝে এক ব্যক্তি ছিল যাকে আমি চিনতে পারি নি। অথচ আমি সেই ব্যক্তির তু লনায় রসূল (সা.)-এর অধিক নিকটে ছিলাম। কিন্তু তিনি এত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন যতটা দ্রুত অগ্রসর হওয়া আমার জন্য সম্ভবপর ছিল না। পরবতীতে দেখলাম, তিনি ছিলেন আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ (রা.)। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছাই। [সেখানে তখন দুইজন ব্যক্তি ছিলেন, অর্থাৎ হযরত তালহাও ছিলেন এবং আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ (রা.)-ও ছিলেন।] তাঁর (সা.) সামনের দুটি দাঁত ও ছেদন দাঁতের মাঝের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল এবং চেহারা ক্ষতবিক্ষত ছিল। তাঁর পবিত্র গালে শিরস্ত্রাণের আংটা ঢুকে গিয়েছিল। রসূ লে করীম (সা.) বলেন, তোমরা দুজনে নিজ সাথিকে সাহায্য করো। অর্থাৎ তিনি (সা.) তালহার দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। তার অনেক বে শি রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। হযরত তালহা মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা বিধান করতে গিয়ে অনেক বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহানবী (সা.) এ কথা বলেন নি যে, আমার শুশ্রূষা করো; বরং তিনি বলেন, যাও, তালহার শুশ্রূষা করো। আমি তাকে (রা.) সেখানে রেখে সম্মুখে অগ্রসর হই, অর্থাৎ আমরা তালহার দিকে মনোযোগ দেই নি বরং মহানবী (সা.)-এর প্রতি মনোযোগী হই যেন শিরস্ত্রাণের আংটা মহানবী (সা.)-এর গাল থেকে বের করে ফেলতে পারি। তখন হযরত আবু উবায়দা বলেন, আমার অধিকারের শপথ! এ কাজটি আপনি আমার জন্য ছেড়ে দিন। অতএব আমি আবু উবায়দার আংটা বের করার অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করে পেছনে সরে যাই। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এটি পছন্দ করেন নি যে, তিনি সেই আংটাগুলো হাত দিয়ে টেনে বের করবেন। কেননা এতে রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর কষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল। তিনি এই আংটাগুলো নিজের দাঁত দিয়ে বের করার চেষ্টা করলেন এবং একটি আংটা বের করলেন। আংটা বের হবার সাথে সাথে তাঁর নিজের সামনের একটি দাঁতও ভেঙে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমিও একইভাবে দ্বিতীয় আংটাটি বের করার চেষ্টা করি। তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) আবার বললেন, আমি আপনাকে আমার অধিকারের কসম দিচ্ছি! আপনি এ কাজ আমার জন্য ছেড়ে দিন। অর্থাৎ দ্বিতীয় আংটাটিও আমিই বের করব, আপনি না। এতে তিনি পিছনে সরে আসলেন। এবারও তিনি পূর্বের মতোই করলেন। হযরত আবু উবায়দার (রা.) সামনের আরেকটি দাঁতও আংটা বের হবার সাথে সাথে ভেঙে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, হযরত আবু উবায়দা (রা.) সামনের দিকের ভাঙা দাঁতবিশিষ্ট লোকদের মাঝে সবচেয়ে সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন।

রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর চিকিৎসা সম্পন্ন করার পর আমরা তালহা (রা.)-র কাছে গেলাম। তিনি একটি গর্তে পড়ে ছিলেন। তার শরীরে বর্শা, তরবারি ও তিরের প্রায় সত্তরটি আঘাত ছিল এবং তার আঙ্গুলও কর্তিত ছিল। আমরা তার ক্ষতস্থানগুলো বেঁধে দিই।(সুবুল হুদা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৯-২০০)

হযরত আবু উবায়দা (রা.) ছাড়াও হযরত উকবা বিন ওয়াহাব (রা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কেও রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, তারা আংটাগুলো বের করেছিলেন। (শারাহ যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২৫)

কিন্তু প্রথম রেওয়ায়েতটি অধিক গ্রহণযোগ্য।হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র গাল থেকে যখন দুটি আংটা বের করা হলো তখন এমনভাবে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল যেভাবে ভরা পানির ব্যাগ থেকে পানি প্রবাহিত হয়। মালেক বিন সিনান (রা.) নিজের মুখে রক্ত চুষতে থাকেন। তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি কি রক্ত পান করছ? তিনি উত্তরে বলেন, জি হ্যাঁ। রসূলু ল্লাহ্ (সা.) বললেন, যার রক্তকে আমার রক্ত স্পর্শ করেছে তাকে আগুন স্পর্শ করবে না।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০০)

এটি 'সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ'-এর রেওয়ায়েত।কিন্তু এই রেওয়ায়েত বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার দাবি রাখে। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন,এটি কতটুকু সঠিক। কেননা যদি এভাবে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করে তাহলে রক্ত বন্ধ হবার পরিবর্তে আরো বেশি রক্তক্ষরণের এবং দুর্বলতা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। পরবর্তী রেওয়ায়েতগুলোতে এর উত্তরও এসে যায়। এজন্য এই রেওয়ায়েতটি অতটা নির্ভরযোগ্য নয়।

উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) যে আঘাত পেয়েছিলেন সে বিষয়ে বুখারীর রেওয়ায়েত রয়েছে।হযরত সাহল বিন সা'দ (রা.)-কে রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর আঘাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার কাছে যদি জানতে চাও তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! আমি ভালোভাবে জানি কে রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর ক্ষতস্থান ধৌত করছিল। অর্থাৎ এই দৃশ্য যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে- কে পানি ঢালছিল আর কী ঔষধ লাগানো হয়েছিল। হযরত সাহল (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মেয়ে হযরত ফাতেমা

(রা.) ক্ষতস্থান ধুচ্ছিলেন এবং হযরত আলী (রা.) ঢালের মাধ্যমে পানি ঢালছিলেন। যখন হযরত ফাতেমা (রা.) লক্ষ্য করলেন, পানির কারণে আরো বেশি রক্ত বের হচ্ছে, তখন তিনি এক টুকরো চট পুড়িয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। সেদিন তাঁর (সা.) সামনের দাঁতও ভেঙে গিয়েছিল আর তাঁর চেহারা ক্ষতবিক্ষত ছিল। তাঁর শিরস্ত্রাণ তাঁর মাথায় ভেঙে গিয়েছিল।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৭৫)

এখানে রক্ত বন্ধ করার এবং ধুয়ে ফেলার উল্লেখ রয়েছে, রক্ত চোষার কোনো উল্লেখ নেই। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত আর এটিই সঠিক।

মহানবী (সা.) যখন গিরিপথের মুখে পৌঁছালেন তখন আলী বিন আবি তালেব (রা.) মিরাসের পানি নিজের ঢালে ভরে রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। 'মিরাস' কী জিনিস? উহুদ পাহাড়ের যেখানে ছোটো-বড়ো গর্তে বৃষ্টির পানি জমা হতো সেই গর্তের নামই মিরাস। মিরাসের অর্থ এটিই লিখিত আছে। এই জায়গা সেই স্থানের নিকট যেখানে হযরত হামযা (রা.) শহীদ হয়েছিলেন। দুর্গন্ধের কারণে তিনি (সা.) তা পান করেন নি; তিনি নিজের চেহারার রক্ত ধুয়ে নেন আর মাথায় পানি দেনআর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তির প্রতি খুব বেশি ক্রোধান্বিত হন যারা তাঁর নবীর চেহারাকে ক্ষতবিক্ষত করে।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) মহিলাদের কাছ থেকে পানি চাইতে গেলেন। তাদের কাছে পানি ছিল না। রসূলু ল্লাহ্ (সা.) খুবই পিপাসার্ত ছিলেন। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) একটি ঝরনার কাছে গিয়ে সেখান থেকে সুপেয় পানি নিয়ে আসেন। রসূলু ল্লাহ্ (সা.) সেই পানি পান করে তার মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন। তিবরানীতে সাহল বিন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা উহুদের দিন ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল এবং তাঁর (সা.) পবিত্র দাঁত শহীদ হয়েছিল।রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিরস্ত্রাণ তাঁর পবিত্র মাথায় ভেঙে গিয়েছিল। মুশরিকরা প্রস্থান করলে মহিলারা সাহাবীদের কাছে গেলেন; তাদের মধ্যে ফাতেমা (রা.)-ও ছিলেন। রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-কে দেখে তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন আর তাঁর ক্ষতস্থান ধৌত করতে লাগলেন। আর আলী (রা.) ঢালের মাধ্যমে পানি ঢালতে লাগলেন। কিন্তু রক্ত বেশি পরিমাণে প্রবাহিত হচ্ছিল, তাই হযরত ফাতেমা (রা.) চাটাইয়ের কিছু অংশ পুড়িয়ে ছাই বানালেন আর তা দিয়ে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলেন। এক পর্যায়ে তা ক্ষতস্থানের সাথে মিশে গেল আর রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০৯-২১০) (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২২) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২৯০)

তাঁর (সা.) পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ঝরছিল। তিনি (সা.) স্বয়ং সেই রক্ত পরিষ্কার করছিলেন আর বলছিলেন, كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوْا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوْا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ সেই জাতি কীভাবে সফল হতে পারে যারা তাদের নবীকে আহত করেছে আর তাঁর কর্তন-দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে; অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে আহ্বান করে? (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৫১)

ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে বর্ণনা অব্যাহত থাকবে।

ফিলিস্তিনের জন্য আমি (বরাবর) দোয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছি। এখন মুসলমানদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিলিস্তিনকে রক্ষা করার কথা চিন্তা করার পরিবর্তে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে। শুনলাম, পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়েগেছে; তারা পরস্পরের ওপর বোমা বর্ষণ করেছে। এখন এমন ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লাই সকল মুসলমান দেশ ও তাদের নেতৃবৃন্দকে বিবেক বুদ্ধি দান করুন। তাদের জন্য দোয়া করুন,আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝার সামর্থ্য দান করেন, তারা যেন এক ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত হয়।

নামাযের পর আমি দু 'জন প্রয়াত ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব।

প্রথমটি সৈয়্যদ দাউদ মুজাফ্ফর শাহ্ সাহেবের পুত্র সৈয়্যদ মওলুদ আহমদ সাহেবের, যিনি কিছুদিন আগে ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন, ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'***। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ও সৈয়্যদা উম্মে তাহের সাহেবার দৌহিত্র ছিলেন আর সাহেবযাদি আমাতুল হাকীম সাহেবা ও সৈয়দ দাউদ মুজাফ্ফর শাহ্ সাহেবের পুত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসিয়্যতকারী ছিলেন। আমার খালাতো ভাইও ছিলেন আর আমার স্ত্রীর বড়ো ভাই ছিলেন।

তার দাদা সৈয়্যদ মাহমুদউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব, সৈয়্যদ আব্দুস সাত্তার শাহ সাহেবের (রা.) পুত্র ছিলেন। হযরত ডা. সৈয়্যদ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেবের (রা.) তাকওয়া ও পবিত্রতা ছিল পরম মার্গের। তিনি পরম বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনকারী ছিলেন আর হুকুকু ল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ আদায়ে অগ্রগামী ছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তার ব্যাপারে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। তিনি (রা.) বলেন, ডাক্তার সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেব স্বয়ং আমাকে বলেছেন, একদা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েন আর এটি সেই যুগের কথা যখন তিনি হুযূর (আ.)-এর বাড়িতে থাকতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছাগল সদকা করেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি রাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র কাছে ছিলাম এবং তাঁকে ঔষধ খাওয়াচ্ছিলাম। সকালে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসলেন তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল নিবেদন করেন, হুযূর! ডাক্তার সাহেব সারা রাত আমার পাশে জেগে ছিলেন এবং ঔষধ ইত্যাদি খাইয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা শুনে খুব আনন্দিত হন এবং বলেন, তাকে দেখে আমাদেরও ঈর্ষা হয়। এটি জান্নাতি পরিবার। হযরত ডা. আব্দুস সাত্তার সাহেব সম্পর্কে একথাটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারবার বলেন। (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৫)

সৈয়দ মওলুদ শাহ্ সাহেব রাবওয়ায় পড়াশোনা করেন অর্থাৎ মেট্রিক করেন, আইএসসি সম্পন্ন করেন। এরপর লাহোরে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। পাকিস্তানেও বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করেন। এরপর কয়েক বছর নাইজেরিয়াতেও একটি কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে যান এবং সেখানে কাজ করেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় খুব সফল জীবনযাপন করেছেন।

তার বিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) পড়িয়েছিলেন। তখন তিনি (রাহে.) যে খুতবা প্রদান করেন তাতে তিনি বলেছিলেন, বৈবাহিক সম্পর্ক গাছের কলমের ন্যায় হয়ে থাকে যেগুলোকে শুরুতেই ভালোভাবে পরিচর্যা করতে হয়।

কিছু পুরোনো বিয়ের খুতবাও আমি পড়ে শুনাই কারণ অনেক মানুষ প্রশ্ন করে যে, আমরা কীভাবে সুন্দর পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি। এসব হলো পথনির্দেশনা, এগুলো দৃষ্টিতে রাখুন যা সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। অনেক সময় আমি নিজে খুতবায় দিকনির্দেশনা বিবাহের এলানের সময় বলে দিই, অনেক সময় বিগত খলীফাদের পথনির্দেশনাও তুলে ধরে থাকি।

তিনি (রাহে.) বলেন, যেটিকে শুরুতেই খুব যত্ন করতে হয়।

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা মোতাবেক এই কলমকে কওলে সাদীদ-এর সুতা দিয়ে বাঁধতে হয়, অর্থাৎ পূর্ণ সত্যতার সুতো দিয়ে বাঁধতে হয়; তখন গিয়ে এর সুরক্ষা বিধান হয়।

এই দায়িত্ব কেবল স্বামী-স্ত্রীর নয়, বরং তাদের পরিবার-পরিজনের ওপর, তাদের আশপাশের লোকদের ওপর বরং তাদের বন্ধুবান্ধবের ওপরও বর্তায়। কেননা অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয় কুধারণা, চোগলখুরি, অধৈর্য অথবা রাগের ফলে। আর সেটিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য কওলে সাদীদ তথা সত্য কথা খুব সুদৃঢ় সুতার ভূমিকা পালন করে।

এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ করুন, আমি এখন যে বিবাহের এলান করছি সেটি উভয় পরিবার,জামা'ত এবং মানবতার জন্য বরকতময় হোক, তাদের মাধ্যমে ধর্মসেবক বংশধর সৃষ্টি হোক। এরপর তিনি বলেন, এই সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে আমার ছোটো বোন আমাতুল হাকীম এবং সৈয়দ দাউদ মুজাফ্ফর শাহ সাহেবের পুত্র সৈয়দ মওলুদ আহমদের এবং ডাক্তার সৈয়দ গোলাম মুজতবার মেয়ে লুবনা শাহবাযের মাঝে। এরপর ডাক্তার সাহেবের বিষয়েও তিনি বলেন যে, ডাক্তার সাহেব ঐসকল প্রাথমিক ডাক্তারদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা পশ্চিম আফ্রিকায় ওয়াকফ করে ডাক্তার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আর তার হাতে আল্লাহ্ তা'লা অনেক আরোগ্য রেখেছিলেন। সফল অস্ত্রোপচারকারী হিসেবে তিনি প্রথমে ঘানায় কাজ করতে থাকেন। এর কিছুকাল পর তাকে নাইজেরিয়া পাঠানো হয়। সেখানেও তিনি তার ওয়াকফে আরযীর মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। এরপর হৃদরোগের কারণে তাকে ফেরত আসতে হয়। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার জন্য দোয়াও করেন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাকে সুস্থ রাখেন এবং তাকে যেন পুনরায় আফ্রিকায় যাওয়ার সৌভাগ্য দেন। আর এই দোয়াও আল্লাহ্ তা'লা কবুল করেন। তিনি আবারও যান এবং দীর্ঘকাল সেখানে অর্থাৎ আফ্রিকায় সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এ দোয়াও করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা সৈয়দ মওলুদ আহমদকেও ধর্মের সেবা করার সৌভাগ্য দান করুন; এবং তিনি এরপর যতটুকুই স্বেচ্ছামূলক কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন-করেছেন।(খুতবাতে নাসের, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৬৫৬-৬৫৭)

তার পুত্র সৈয়দ সউদ আহমদ বলেন, আমার পিতা প্রথম থেকেই নামায আদায়ে যত্নবান , ফজরের নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াতকারী

এরপর ৮ পাতায়...

কেউ তো আর চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে না। কোন না কোন সময় তো অবশ্যই পাওয়া যায়। সপ্তাহান্তে ছুটি তো অবশ্যই পাওয়া যায়। এই সব দেশে সপ্তাহান্তের ছুটিও থাকে। তাই ওভারটাইম করার সপ্তাহান্তের ছুটিকেও যদি রোজগার করার কাজে লাগিয়ে দাও তবে এর লাভ কি? তাদের উচিত সপ্তাহে অন্তত দুই-এক দিন জামাতের জন্য উৎসর্গিত করা।

আমরা এভাবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলব, তাদের সঙ্গে নিজেদের উন্নত নৈতিক আচরণ প্রদর্শন করব আর এতে তারা আহমদীয়াতের কাছাকাছি আসবে এবং আহমদীয়াতের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবে। এর ফলে তবলীগের পথও খুলে যাবে।

মানুষ সচরাচর নিজের সন্তানের বিষয়টা মাথায় রাখে। অনেকে আবার লোকের সামনে ছোটদেরও ভীষণ বকাঝকা করে, এমনকি নিজেদের বাচ্চাদেরও। কিন্তু নিজের সন্তানের প্রতি আচরণ কিছুটা হলেও পৃথক হয়ে থাকে। এটা অন্যায়। যদি কোন যুবককে বোঝাতে হয় তবে বড়দেরও উচিত সেই যুবকের আত্মসম্মানের প্রতি সংবেদনশীল থেকে তাকে বোঝানো। আর যদি ছোটরা বড়দের সঙ্গে কথা বলে তবে তাদেরও উচিত শিষ্টাচার বজায় রেখে বড়দের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি যত্নবান থাকা, অজ্ঞদের ন্যায় সামনের জনের কথা না শুনে মুখে যা আসে তাই বলে ফেলা উচিত নয়।

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর সঙ্গে ফিনল্যান্ডের ওয়াকফে নওদের অনলাইন সাক্ষাত

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ১৮ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে ফিনল্যান্ড-এর ১০ বছর এবং তদোর্ধ্ব বয়সের ওয়াকফে নও ছেলে ও মেয়েদের সঙ্গে অন-লাইন সাক্ষাত করেন।

সাক্ষাতে হুযুর তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রশ্নোত্তরগুলি উপস্থাপন করা হল।

প্রশ্ন: একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন নিবেদন করে যে, যে সব ওয়াকফে নও ছেলেরা পড়াশোনা ছেড়ে দেয় বা পড়াশোনা শেষ করার পর নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ওয়াকফ-এর বিষয়ে জামাতকে কিছুই জামাতকে কিছুই জানায় না, এমন ওয়াকফীনে নওদের প্রতি হুযুরের কি উপদেশ থাকবে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, মা-বাবা যখন সন্তানকে ওয়াকফ করেছে, সেক্ষেত্রে তারা সন্তানকে এই শিক্ষা দিবে যে পনেরো বছর হওয়ার পর তারা নিজেরাই জামাতকে বন্ড বা চুক্তির নবায়ন করার জন্য এগিয়ে আসবে আর বলবে যে তারা পনেরো বছরের হয়ে গিয়েছে, এখন পড়াশোনা করছে, পড়া শেষ হলে জামাতের কাজের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করবে। নীতিগতভাবে এমনটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এরপর ২১-২২ বছরে যখন ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা শেষ করে তখন পুনরায় জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, পড়াশোনা শেষ হয়েছে আর এখন এই কাজ করেছি, এখন আমার জন্য কি করণীয়? তাই নীতিগতভাবে এটি একটি অঙ্গীকার যা মা-বাবা নিজেদের সন্তানদের বিষয়ে জামাতের সঙ্গে করে থাকে আর সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করা উচিত। এরপর সন্তান সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। যদি সন্তান কাজ না করতে চায়, জামাতের সেবা করতে না চায়, তবে সরাসরি লিখে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, আমার মা-বাবা ওয়াকফ করেছিল, কিন্তু আমাদের পরিস্থিতির কারণে আমি এমনটি করতে চাই না। তাই নীতিগতভাবে সততারও দাবি এই যে, যখন পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে, তখন নিজের কাজের জন্য অনুমতি নিক, মরকযকে জানাক যে, আমি পড়াশোনা করেছি, এখন আমি নিজের কাজ করব না কি মরকয আমার থেকে কোন সেবা নিতে চাই। মরকয প্রায় একথাই বলে দেয় যে, তোমরা নিজের কাজ কর। আর যারা মাঝেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, অকর্মা হয়ে থাকে, তাদের তো এমনিতেই ওয়াকফ ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং জানিয়ে দেওয়া উচিত এবং জানিয়ে দেওয়া উচিত যে সে কোন পড়াশোনা করে নি আর এখন সে কি করবে? কেননা, শিক্ষিত লোকই আমাদের প্রয়োজন, ওয়াকফে নও হিসেবে অশিক্ষিত আমাদের দরকার নেই। তাই সততার দাবি হল তাদের জানিয়ে দেওয়া যে, তাদের মা-বাবা অঙ্গীকার করেছিল যে, এই অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য তোমরা ১৫ বছর বয়সে নিজেদের চুক্তির নবায়ন করবে এবং ২১ বছর বয়সে পুনরায় নবায়ন কর এবং এ বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ থাক।

প্রশ্ন: কিছু ওয়াকফনী যারা ওয়ার্ক ভিসা কিম্বা অস্থায়ী ভিসা নিয়ে এখানে থাকে আর এই সব দেশে থাকার জন্য তাদেরকে কাজ করতে হয়, তারা কিভাবে নিজেদেরকে ওয়াকফীন হিসেবে পেশ করবে আর জামাতের সেবা করবে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, কেউ তো আর চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে না। কোন না কোন সময় তো অবশ্যই পাওয়া যায়। সপ্তাহান্তে ছুটি তো অবশ্যই পাওয়া যায়। এই সব দেশে সপ্তাহান্তের ছুটিও থাকে। তাই ওভারটাইম করার সপ্তাহান্তের ছুটিকেও যদি রোজগার করার কাজে লাগিয়ে দাও তবে এর লাভ কি? তাদের উচিত সপ্তাহে অন্তত দুই-এক দিন জামাতের জন্য উৎসর্গিত করা। আমরা যদি সপ্তাহান্তের একদিন ওভার টাইম করি আর এক দিন জামাতকে দিই তবে জামাতের যে কাজ থাকবে তা আপনার সোপর্দ করতে পারবে। এটাই বাস্তব। এখানে আপনারা কিভাবে এসেছিলেন? স্টুডেন্ট ভিসায় এসেছিলেন? (তারা উত্তর দেয়, জ্বী হুযুর)। হুযুর আনোয়ার বলেন, পাকিস্তান ছেড়ে এখানে স্টুডেন্ট ভিসায় একারণে এসেছিলেন উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কিম্বা সেখানে আপনাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ ছিল না। এইজন্যই তো এসেছিলেন। শিক্ষার সুযোগ কেন ছিল না? (তারা উত্তর দেয়, যেভাবে এখানে আমরা স্বাধীনভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছি সেটা ওদেশে পাওয়া যেত না) হুযুর আনোয়ার বলেন, স্বাধীনভাবে নিজেদেরকে আহমদী পরিচয় দিয়ে এখানে থাকতে পারেন, অপরদিকে সেখানে লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকতেন। এর অর্থ আহমদীয়াতের কারণে আপনারা এখানে এসেছেন, শরণার্থী হিসেবে হোক বা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে হোক, যেহেতু পাকিস্তানে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। অতএব, যে ধর্মের নামে এখানে এসেছেন, সেই ধর্মেরও কিছু অধিকার বর্তায়। তাই আমি বলন, সপ্তাহে এক দিন করে অবশ্যই জামাতকে দিন। সততা এবং নৈতিকতার এটিই দাবি। বাকি আপনার ইচ্ছে।

প্রশ্ন: কেউ কেউ দাবি করে, 'কারো হয়তো খারাপ লাগতে পারে, আমরা কেবল স্পষ্ট কথাই বলি। ' এমন মানুষ অনেক সময় এমন কথা বলে বসে যা অন্যদের অনেক কষ্ট দেয়। হুযুর! এই পন্থা কি সঠিক?

হুযুর আনোয়ার বলেন, কথা হল, কেবল স্পষ্ট কথা বলা কৃতিত্বের কিছু নয়। আরব বেদুইনরাও স্পষ্টবাদী ছিল। তাদের বিষয়ে আমরা কি বলি? তাদেরকে আমরা বেদুইনই বলে থাকি, শিক্ষিত তো আর বলি না। যে বেদুইন হযরত উমর (রা.) কে ধরে টেনে ধরত, তাকে তো আমরা মহান সাহাবী বলি না। যে এমন কাজ করে তাকে তো আমরা অজ্ঞ ও উন্মাদ ব্যক্তিই বলে থাকি। হযরত উমর এবং সেই সব পুণ্যবান সাহাবারা নিজেদের ধৈর্য ও মহানুভবতার কারণে এই ধরণের কাজ সহ্য করে নিতেন। কিম্বা যে ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর গলায় চাদর দিয়ে টানতে শুরু করেছিল সে কি বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল? তার কাজ তো পাগলের মতই ছিল। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই এগুলো অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ, আর অজ্ঞদের কথা সহ্য করা উচিত। আর বড়দের প্রতি সম্মান দিয়ে কথা বলা,বা তাদের কথার উত্তর দেওয়ার বুদ্ধিই থাকে না। তারা তাদের কথা বোঝার চেষ্টা করে না বা তাদেরকে বোঝানো হলে নিজেদেরকে বড় মনে করে। আর ছোটদের বোঝানোর ক্ষেত্রে সদিচ্ছা থাকা দরকার। এটাই নৈতিকতা। আর এমন সময় বোঝানো উচিত যখন তারা বুঝতে পারে, উল্টে প্রতিক্রিয়া না দেখায়। বড়দের মধ্যে কেউ কেউ যুবকদেরকে প্রকাশ্যে বলে দেয়। পাঞ্জাবীতে বলে, তুমি এমন কাজ কেন করেছ, তুমি অনর্থক কাজ কর

ছিলেন; [বরং আমি জানি, তাহাজ্জুদ আদায়কারীও ছিলেন]। তিনি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াতও করতেন । অতঃপর তিনি বলেন, রাতে ঘুমানোর পূর্বে আমাদেরকে পুরোনো বুযুর্গদের কাহিনি এবং ঘটনাসমূহ শোনাতেন। নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন এবং আমাদেরকেও নিয়মিত চাঁদা আদায় করার উপদেশ প্রদান করতেন। হাতখরচ দেওয়ার পর বলতেন, প্রথমে চাঁদা আদায় করে আসো। ঈদী পেলেও বলতেন, চাঁদা আদায় করো। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ফাইল বানানো ছিল। একইভাবে যখন ওসিয়্যত করিয়েছেন বাচ্চাদের জন্যও পৃথক ফাইল বানিয়েছেন, নিজের রেকর্ডও রেখেছেন এবং সব চাঁদা নিজে আদায় করতেন। রমযান মাসের রোযা ছাড়া শাওয়ালের রোযাও রাখতেন। রমযানে দুবার কুরআন করীম খতম দিতেন এবং তিনবার খতম দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

তিনি আরো লেখেন, অত্যন্ত খাঁটি মানুষ ছিলেন, বড়োই নির্ভেজাল, স্বচ্ছপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন, সোজাসাপ্টা কথা বলতেন। অত্যন্ত মিশুক ছিলেন। কারো সাথে পুরোনো সম্পর্ক থাকুক বা নতুন সম্পর্ক হোক– তিনি নিজে যোগাযোগ রাখতেন এবং কোনো না কোনো উপায়ে খবরাখবর নিতেন। ছোটো কিংবা বড়ো সবার সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। কারো সম্পর্কে হৃদয়ে বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। হিংসা ছিল না। অন্য কেউ চরম বাড়াবাড়ি করলেও তিনি সর্বদা সদাচরণ করতেন। কেউ অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করলেও তিনি নিজে গিয়ে তার সাথে সুসম্পর্ক গড়তেন।একথা কেবল তার ছেলে–ই লিখে নি বরং আমিও দেখেছি, সত্যিকারার্থে এসব গুণাবলি তার মাঝে ছিল।

আমার পর্যবেক্ষণও এটাই আর তার পরিচিত অনেক সমবেদনা প্রকাশকারী ব্যক্তি একথা লিখেছেন যে, সত্যিই এসব গুণাবলি তার মাঝে ছিল। অতঃপর এই ছেলেই লিখেছে, একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সফরে গেলে তার জন্য উপহারস্বরূপ একটি খেলনা নিয়ে আসেন যেটিকে তিনি খুলে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে বলেন, আমি তোমাকে উপহার দিলাম আর তুমি তা টুকরো টুকরো করে ফেলেছ! তখন তিনি বলেন, আমি এখনই ঠিক করে দিচ্ছি;আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)–র সামনে জোড়া লাগিয়েও দেন। অতঃপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার মাকে বলেন, একে ইঞ্জিনিয়ার বানাবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)–র একথাও পূর্ণ হয়, পরে তিনি ইঞ্জিনিয়ার হন এবং অনেক ভালো ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

অতঃপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)–র একটি উপদেশ যা সবার জন্য অনেক উপকারী– তা বলে দিচ্ছি। একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সিন্ধুতে নিজের জমি বা ফার্মে গিয়েছেন; তিনিও সেসময় সেখানে ছিলেন। তিনিও তার পিতার সাথে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)–র সাথেই গিয়েছেযিনি জমির খবরাখবর নেয়ার জন্য। সেসময় আমের মৌসুম ছিল। ঠিকাদাররা ফল পেড়ে নীচে রেখেছিল। বাগানের ঠিকা দেওয়া হয়, বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং ফলের মালিক হয়ে থাকে ঠিকাদার নিজে। কিছু অংশ জমির মালিক নিয়ে থাকে। যাহোক, সে নিজেদের ফল পেড়ে রেখেছিল। ইনি শিশু ছিলেন, সেখান থেকে একটি আম তুলে নেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ফেরত দিয়ে আসো। এটি এখন তোমার মালিকানায় নয় বরং এটি ঠিকাদারদের মালিকানা।

এটা ছিল হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)–র শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি। তিনি এটি বলতে পারতেন, আমরা যে অংশ পাই তা থেকে তাকে ফেরত দেওয়া হবে; কোনো সমস্যা নেই, তুমি খেতে পার। কিন্তু না, তিনি তার দৌহিত্রের এভাবে তরবিয়্যত করেছেন।

অতঃপর সৈয়দ মওলুদ সাহেবের কন্যা স্নেহের মারিয়া বলে, পবিত্র কুরআন এবং রূহানী খাযায়েন ও মলফুযাত সবসময় পাঠ করতেন। একইভাবে আমি এটিও জানি যে, তফসীরে কবীরও পাঠ করতেন এবং গভীর জ্ঞান রাখতেন। নিজের জ্ঞান মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন না, কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে কথা হলে কোনো প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করলে খুব সুন্দর উত্তর দিতেন। এটি আমাকে অনেকেই জানিয়েছেন।

ধর্মীয় এবং জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যখনই কোনো সমস্যা তুলে ধরতাম, তিনি সঠিক সমাধান দিতেন। দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার উপদেশ দিতেন এবং এটি বলতেন যে, তোমরা দোয়া করো আর বিষয়টি আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দাও।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার স্ত্রী–সন্তানদের সুরক্ষা করুনও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

তার এক ভাই সৈয়দ সুহায়েব লিখেছেন, তার অসাধারণ একটি গুণ ছিল– সুখের বা দুঃখের সময় তিনি সর্বাগ্রে আনন্দ বা সমবেদনা প্র কাশ করতেন, অভিনন্দন জানাতেন; কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে তিনি সবার আগে যেতেন।

হানিফ মাহমুদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ; তিনি লিখেছেন, ইসলামাবাদে থাকাকালে তার সাথে পরিচয় হয়েছিল। সহজ–সরল, নীরব প্রকৃতির দরবেশ ও ফেরেশতাতুল্য মানুষ ছিলেন। ওয়াকেফে যিন্দেগীদের, বিশেষ করে মুরব্বীদের প্রতি বিশেষ সম্মান রাখতেন। ইসলামাবাদে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাবওয়াতেও সেটিকে বজায় রেখেছেন। প্রায়ই মসজিদে নিজেই খুঁজে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি আরো বলেন, যখনই তাকে দোয়ার জন্য অনুরোধ করতাম এরপর তিনি আমাদের খবরাখবর নিতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদের মধ্যেও এই পুণ্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযা যার পড়াব তার নাম হচ্ছে মোকাররম আকমিদ আগ মুহাম্মদ সাহেব , যিনি বুরকিনা–ফাসোর ডোরির রিজিওনের মাহদিয়াবাদ জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সম্প্রতি ৬৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'*** । তিনি তার অবর্তমানে দুই স্ত্রী, দশ পুত্র এবং পাঁচকন্যা রেখে গেছেন।

মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, খুব চটপটে, কর্মঠ মানুষ ছিলেন। আমিসম্প্রতি সেখানে গিয়েছিলাম। ডোরির শহীদ পরিবারগুলোকে তিনি নিজে তাদের ঘর বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন; জামা'তের পক্ষ শহীদ পরিবারগুলোকে নতুন ঘর তৈরি করে দেয়া হয়েছে, তিনি নিজেসেখানে তাদেরকে গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। দুদিন পর নিজের বাড়িতে যান, গুরুতর হার্ট অ্যাটাকের কারণে সেখানে অচেতন হয়ে পড়ে যান এবং তার মৃত্যু হয়।

১৯৯৯ সনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। আহমদী হবার পর হিজরত করে মাহদিয়াবাদে ইব্রাহীম বিদিগা সাহেবের কাছে চলে যান এবং তার সাথে আশপাশের গ্রামগুলোতে তবলীগের জন্যও যেতেন। তবলীগ করে তিনি বহু জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বন বিভাগের ফরেস্ট গার্ডের একজন প্র তিনিধি হিসাবে সরকারী চাকরি করতেন। সেখানে সন্ত্রাসের কারণে অবসরে চলে যান। ফসল কাটা হলে সকল সদস্যদের ফসলের হিসাব করে যাকাতের অংশ আদায় করতেন এবং নিজে তা সেক্রেটারি মালের কাছে পৌঁছে দিয়ে রসিদ কাটাতেন। মাহদিয়াবাদ জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসাবে পাঁচ বছর সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। নম্র এবং শান্তশিষ্ট স্বভাবের মানুষ ছিলেন, কখনো রাগ করতেন না। ১১ জানুয়ারি ২০২৩ সালে যখন সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে সেদিন তিনি মাগরিবের নামায পড়ে নিজ বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন।এই ঘটনার পর জামা'তের সদস্যদের মাঝে অনেক ভয়ভীতি ও আতঙ্ক বিরাজমান ছিল আর শাহদাতের কারণে মানুষ অনেক আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। তিনি তাদেরকে অনেক সাহস যুগিয়েছেন। আর দ্বিতীয়বার আমি যখন তাকে মাহদিয়াবাদের লোকদেরকে ডোরি শহরে স্থানান্ত রের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য বলি তখন তিনি কঠোর পরিশ্রম করে সব কাজ সম্পন্ন করেছেন। তিনি মানুষদেরকে অভয় ও উৎসাহ দিয়েছেন। জামা'তের সদস্যদেরকে নিজ তত্ত্বাবধানে ডোরিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত শহীদ পরিবারগুলোর প্র য়োজনের খেয়াল রাখতেন।

ডোরির মুবাল্লিগ রানা ফারুক সাহেব বলেন, ফজর নামায শেষে প্রত্যহ শহীদদের পরিবারের সদস্যদেরকে সালাম দেবার জন্য যেতেন আর খোঁজখবর নিতেন। কোনো সমস্যা হলে দ্রুত তার সমাধান করার চেষ্টা করতেন। তিনি বলেন, এখন ডোরিতে বিভিন্ন জামা'তের সমস্যাকবলিত প্রায় আটশর মতো মানুষ রয়েছে, তাদের সবার দেখা করতেন। সর্বদা তাদের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। নামাযে ছিলেন খুবই নিয়মিত এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতাকারী ছিলেন;অন্যদেরকেও এর উপদেশ দিতেন।আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার সন্তানদেরকে ও আত্মীয়স্বজনদেরকে ধৈর্য দান করুন আর তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

****

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: প্রশ্ন: এক আহমদী বন্ধু হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছেন যে, "তারেক ম্যাগাজিনে" প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে জিন্নদের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর বাহ্যত এই দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেছেন যে, জিন্নদের অস্তিত্ব আছে আর এটি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরা আপত্তি করে। এর কি উত্তর দেওয়া যেতে পারে?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১৮ মার্চ, ২০২১ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

হুযুর আনোয়া বলেন, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ব্যাপকহারে 'জিন্ন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ লুকিয়ে থাকা জিনিস। তা নিজের গঠনগত কারণে লুকিয়ে থাকুক কিংবা নিজের অভ্যাসগত কারণে গুপ্ত থাকুক। আর এই শব্দটি বিভিন্ন সীগা বা মূলধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দে কিংবা Derivative তথা অমৌলিক শব্দে রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় আর এসব অর্থের মধ্যে গোপন, লুকানো এবং পর্দার অন্তরালে থাকার অর্থ কিংবা মর্ম সম্মিলিতভাবে পাওয়া যায়।

অতএব, জিন্নের বৈশিষ্ট্যে সৃষ্ট বিভিন্ন শব্দ, উদাহরণস্বরূপ: 'জান্না' ছায়াঘেরা এবং অন্ধকারে পর্দাবৃত করা, 'জানীন' মাতৃগর্ভে লুকোনো শিশু। 'জনূন' সেই রোগকে বলা হয় যা বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। 'জিনান' বক্ষের মাঝে লুকোনো হৃদয়। 'জান্নাত' অর্থ যে বাগানের গাছপালার ঘন ছায়া জমিনকে ঢেকে রাখে। 'মাজান্নাহ্' অর্থ ঢাল, যার পেছনে যোদ্ধা নিজেকে লুকিয়ে রাখে। 'জান্নুন' অর্থ সাপ, যা মাটির গর্তে লুকিয়ে থাকে। 'জানান' অর্থ কবর, যা মরদেহকে নিজের ভেতরে লুকিয়ে রাখে। 'জুন্নাহ্' অর্থ ওড়না, যা মাথা এবং দেহকে আবৃত করে রাখার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া জিন্ন শব্দটি পর্দানশিন নারীদের জন্যও ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু এমন বড় বড় নেতা এবং জ্যেষ্ঠ মানুষদের জন্য বলা হয়, যারা সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা করে না। এমনকি এমন জাতির মানুষজনের জন্যও (জিন্ন শব্দ) ব্যবহৃত হয় যারা ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দূরদূরান্তের অঞ্চলে বসবাস করে এবং বিশ্বের অপরাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

একইভাবে অন্ধকারে বসবাসকারী জীবজন্তু এবং অনেক ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ এবং সূক্ষ্ম জীবাণুর জন্যও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ কারণেই মহানবী (সা.) রাতের বেলা নিজেদের পানাহার পাত্রকে ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর হাড়গোড় দ্বারা শৌচকর্ম করতে বারণ করেছেন এবং এগুলোকে জিন্ন অর্থাৎ, পিঁপড়া ও অন্যান্য জীবাণুর খাদ্য আখ্যা দিয়েছেন।

এছাড়া জিন্ন শব্দটি লুক্কায়িত দুষ্ট আত্মাদের অর্থাৎ শয়তান এবং লুক্কায়িত পবিত্র আত্মাদের অর্থাৎ ফেরেশতাদের জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমনটি বলা হয়েছে,

مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ

অর্থাৎ, আমাদের মাঝে কিছু লোক ছিলসৎকর্মশীল এবং আমাদের মাঝে কিছু ছিল এর বিপরীত। (সূরা আল্ জিন্ন: ১২)

জামা'তের সাহিত্য, বিশেষত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং আহমদী খলীফাদের বিভিন্ন রচনা ও বক্তব্যে জিন্ন শব্দটি সাধারণত এই অর্থেই বর্ণিত হয়েছে। আর এসব আলোচনা ও বক্তব্যে আমজনতার মস্তিষ্কে বিদ্যমান জিন্নদের সম্পর্কে এমন অর্থ ও বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মানুষের ওপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, মহিলাদের ভেতরে ঢুকে যায়, লোকজনকে কষ্ট দেয় অথবা তাদেরকে কাবু করে ফেলে এবং তাদেরকে তাদের পছন্দের জিনিস এনে এনে দেয়। এমন জিন্ন মূলত যাদের সন্দেহের বাতিক আছে তাদের কল্পনা প্রসূত সৃষ্টি, ইসলামী শিক্ষা একে কোনভাবেই গ্রহণ করে না। যেমন, জিন্নদের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "এ বিষয়ে আমাদের ঈমান রয়েছে কিন্তু ইরফান বা তত্ত্বজ্ঞান নেই, এছাড়া আমাদের নিজেদের ইবাদত, সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জিন্নদের কি প্রয়োজন রয়েছে? মহানবী (সা.) কত উত্তম কথা বলেছেন, [ইসলামের অনুসারী মানুষের তথা মুসলমানদের এটিও একটি সৌন্দর্য যে, তারা অনর্থক ও বাজে বিষয় পরিত্যাগ করে। (তিরমিযী, কিতাবুয্ যোহোদ)-অনুবাদক] মানুষের জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, যাত্রা অনেক দীর্ঘ ও কঠিন, এ কারণে পাথেয় নেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। এসব অনর্থক ও বাজে কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকা একজন মু'মিনের সম্মান পরিপন্থি। খোদার সাথেই মীমাংসা করে নাও এবং তাঁর প্রতিই ভরসা রাখো, কেননা তাঁর চেয়ে শক্তিমান আর কেউ নেই। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই।"

(মালফুযাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০৩, ২০১৬ সালে প্রকাশিত)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এই কল্পিত জিন্নদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলেন,

"এখানে একটি ছেলে থাকতো, তার নাম ছিল আব্দুল আলী। তারা বাবা জিন্ন হাজির করতে পারে বলে বড় বড় দাবি করতো। সে আমার সাথে অধিকাংশ সময় ছিল, কিন্তু কখনও আমার সামনে কোন জিন্ন উপস্থিত করতে পারে নি।"

(মিরকাতুল ইয়াকীন ফী হায়াতি নূর উদ্দীন, পৃ. ২৪৯, ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মুদ্রিত)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর বিভিন্ন রচনা, খুতবা ও বক্তৃতায় জিন্নের বিষয়টিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে খুবই বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এবং পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত শিক্ষামালার আলোকে সে ধরনের জিন্নের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন, যা সাধারণ মানুষের মন-মস্তিকে বিদ্যমান রয়েছে যে, তারা মানুষের মাথায় চড়ে বসে অথবা কোন কোন মানুষের বশে এসে যায় এরপর তারা সেসব জিন্ন দ্বারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করান। অতএব, জিন্ন সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (রা.) লিখিয়েছেন যে,

"আমি জিন্নদের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখি কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস রাখি না যে, সে কারও মাথায় চেপে বসে অথবা (কাউকে) মণ্ডা-মিঠাই এনে দেয়। যেভাবে ফেরেশতা কারও মাথায় চড়ে না (সেভাবে) জিন্নও চড়ে না। যেভাবে ফেরেশতারা মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে একইভাবে জিন্নরাও সাক্ষাৎ করে, তবে সেভাবে যেভাবে তাদের সত্তা তাদেরকে অনুমতি দেয়। মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা সম্পর্কে আমি মনে করি, (এই শিক্ষা) জিন্ন এবং মানুষ উভয়ের জন্য এবং জিন্নদেরও তাঁর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। তাঁর ওহীর ওপর আমল করাও (আবশ্যক)। কিন্তু আমার এই বিশ্বাসও এ বিষয়ের কারণেই হয়েছে, আমি যেন এই বিশ্বাসও রাখি যে, তারা কারও মাথায়ও ভর করতে পারে না আর মণ্ডা-মিঠাইও এনে দিতে পারে না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য আবশ্যক ছিল, তারা যেন তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। জিন্নদের মধ্যে যদি মানুষকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার শক্তি থাকতো তাহলে তারা আবু জাহল প্রমুখদের মাথায় কেন ভর করলো না? (তাহলে তো) তাদের কোন কুরবানীও করতে হতো না। মানুষজন বলে যে, জিন্ন মিষ্টি এনে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমি এমন জিন্নদের (বিষয়ে) বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না, যারা যদু-মধুকে তো মিষ্টি এনে খাওয়াতে পারে ঠিকই কিন্তু সেই ব্যক্তি যাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন আবশ্যক ও অপরিহার্য ছিল, কতক জিন্ন তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলও বটে। (তিনি) তিন দিন পর্যন্ত উপোস থাকছেন অথচ তাঁকে (একটি) রুটিও এনে দেয় নি। মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন যদি তাদের জন্য আবশ্যক না হতো তাহলে সন্দেহ জাগতো যে, তারা অবশ্যই মানুষকে পৌঁছাতে পারে কি পারে না, কিন্তু এখন এটি নিশ্চিত যে, তারা এমনটি করতে পারে না। বাকী থাকলো, মহিলাদের মাথায় জিন্ন ভর করে, এগুলো সব রোগব্যাধি অথবা কুসংস্কার কিংবা বিজ্ঞানের কারসাজি। যেভাবে রাতের বেলা ফসফরাস জ্বলজ্বল করে অথবা অধিকাংশ কবরস্থানে তা দেখা যায়। কেননা, হাড়গোড় থেকে ফসফরাস নির্গত হয় এবং তা চমকাতে থাকে অথচ সাধারণ মানুষ একে জিন্নদের কারসাজি বলে আখ্যায়িত করে।"

(কাদিয়ান দ্বারুল্ আমান থেকে প্রকাশিত আল্ ফযল পত্রিকা, নম্বর: ৮২, অষ্টম খণ্ড, ০২ মে, ১৯২১, পৃ. ৭)

অনুরূপভাবে ফাযায়েলুল কুরআন নামে প্রকাশিত নিজের একটি বক্তৃতায় হুযূর (রা.) জিন্নদের সম্পর্কে ভিন্ন এক আঙ্গিকে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, "কেউ কেউ বলে, জিন্ন হল অমানব সত্তা, যারা মহানবী (সা.), হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল। কিন্তু দেখতে হবে যে, পবিত্র কুরআন এই অর্থে বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেয় কি-না? যদি এটি একটি রূপক বিষয় হয় তাহলে নিশ্চয় পবিত্র কুরআন নিজের অন্য কোন আয়াতের আলোকে এ বিষয়টির সমাধান করবে আর রূপক বলে গ্রহণ না করলে সেক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াতের মাঝে সংঘর্ষ হবে আর এভাবে পবিত্র কুরআনে মতভেদ সৃষ্টি হবে। কাজেই, আমাদেরকে দেখতে হবে, এটিকে যদি রূপক হিসেবে গ্রহণ না করা হয় তাহলে কি পবিত্র কুরআনে মতভেদ দেখা দেয় না-কি রূপক বলে গ্রহণ করলে মতভেদ দেখা দেয়? রূপক বিষয়টি যারা বোঝে না তারা বলে এটি এমন একটি শব্দ যেমন শয়তান শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে শয়তান বলতে এমন এক সৃষ্টি বোঝায় যা মানুষ থেকে ভিন্ন। অনুরূপভাবে জিন্নও এমন এক সৃষ্টি যারা মানুষ থেকে ভিন্ন। অথচ তফসীরকারকগণ বিনাবাক্যে এই আয়াত, وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ অর্থাৎ, যখন তারা নিজেদের দলনেতাদের সাথে নিভৃতে মিলিত হয়। (সূরা আল্ বাকারা: ১৫)-অনুবাদক] এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এখানে শায়াতীন বলতে ইহুদী এবং তাদের জ্যেষ্ঠ নেতাদের বুঝানো হয়েছে। কাজেই, মানুষ যদি শয়তানে পরিণত হতে পারে তাহলে মানুষ কেন জিন্ন হতে পারবে না?

একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا

(সূরা আল্ আনআম: ১১৩)অর্থাৎ, আর এভাবেই আমরা মানুষ ও জিন্নদের মধ্য থেকেও শয়তানদেরকে

প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়ে দিয়েছি। যারা লোকদেরকে বিরোধিতা করতে প্ররোচিত করতো আর তাদেরকে নবী এবং তাঁর জামাতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, মানুষও শয়তান হয়ে থাকে। কাজেই শয়তান যদি মানুষ হতে পারে তাহলে জিন্ন কেন মানুষ হতে পারবে না? অর্থাৎ, যেভাবে মানুষের মধ্য হতে শয়তান আখ্যায়িত হওয়ার মতো বিষয় সৃষ্টি হতে পারে সেভাবেই তাদের মধ্য হতে জিন্ন আখ্যায়িত হওয়ার মতো (মানুষও) সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই, কুরআন থেকেই জানা গেল, শুধু সুলায়মান (আ.)-এর নিয়ন্ত্রণেই শয়তান ছিল না বরং হযরত মূসা (আ.) এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতিও জিন্নরা ঈমান এনেছিল।"

(ফাযায়েলুল্ কুরআন, নম্বর: ৬, পৃ. ৩৮৭-৩৮৮)

অনুরূপভাবে তফসীরে কবীরে জিন্নদের সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পর এই আলোচনার সারাংশ লিখতে গিয়ে হুযূর (রা.) বলেন,

"আলোচনার সারমর্ম হল, পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন অর্থে জিন্ন (শব্দ) ব্যবহৃত হয়েছে। (১) জিন্ন বলতে সেসব লুকোনো প্রাণী বুঝায়, যারা একপ্রকার অদৃশ্য শয়তান। এই সৃষ্টি সেভাবেই অপকর্মের প্রেরণা সঞ্চার করে যেভাবে ফেরেশতারা বিভিন্ন পুণ্যকর্মের প্রেরণা সৃষ্টি করে থাকে। তবে পার্থক্য হল, ফেরেশতাদের প্রেরণা ব্যাপক পরিসরে হয় আর তাদের (অর্থাৎ জিন্নদের) প্রেরণা সীমিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদের আকর্ষণ তার প্রতিই থাকে যা স্বয়ং নিজের ইচ্ছায় মন্দ চিন্তা-ভাবনার দিকে আকৃষ্ট হয়। এদেরকে শায়াতীনও বলে। (২) পবিত্র কুরআন জিন্ন বলতে Cave Men বা গুহাবাসীদেরও বুঝিয়েছে। অর্থাৎ, মানুষের এলহাম লাভের যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে যে-সব মানব মাটির নিচে (বা গুহায়) বসবাস করতো এবং কোন আইন-শৃঙ্খলার অধীনে ছিল না। তবে, ভবিষ্যতের জন্য পবিত্র কুরআন এই পরিভাষা নির্ধারণ করেছে, অর্থাৎ যারা আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য রাখে তাদের নাম ইনসান রেখেছে আর যারা অগ্নি-স্বভাবী এবং আনুগত্যকে পরিহার করে, তাদের নাম জিন্ন রাখা হয়েছে। (৩) উত্তরাঞ্চলের সেসব মানুষ অর্থাৎ ইউরোপ প্রভৃতির যেসব মানুষ এশিয়ার লোকজনের সাথে মেলামেশা রাখতো না এবং যাদের জন্য শেষ যুগে বিস্ময়কর জাগতিক উন্নতি এবং ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ করা নির্ধারিত ছিল, সূরা রহমানে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। (৪) বিধর্মী এবং অপরিচিত লোকদের, যাদেরকে বিভিন্ন জাতি তথা হিন্দু এবং ইহুদীরা নতুন কোন সৃষ্টি বলে মনে করে। তাদেরকে সাধারণ প্রবাদ হিসেবে জিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন, সুলায়মান (আ.)-এর জিন্ন কিংবা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী মানুষজন।

আমার মতে, দোযখে গমনকারী যে-সব জিন্ন এর উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের বলতে হয়ত সেসব অগ্নি স্বভাববিশিষ্ট লোকজন, যারা আনুগত্যের বাইরে থাকে। আর কোন ধর্ম কিংবা শিক্ষা গ্রহণ করে না। আর দোযখবাসী ইনসান বলতে সেসব কাফিরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোন না কোন ধর্মের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। অথবা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জাতিকে জিন্ন আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর দক্ষিণাঞ্চল ও প্রাচ্যের লোকজনকে ইনস বা মানুষ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সাধারণত এই লোকেরা এই নামেই প্রসিদ্ধ ছিল।...

এই আলোচনা শেষ করার পূর্বে আমি একথাও বলে দিতে চাই যে, অনেক প্রবীণ গুরুজন নিদেনপক্ষে আমার সাথে এ বিষয়ে সহমত যে, এমন কোন জিন্ন নেই যারা এসে মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদের ওপর ভর করে এবং তাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করায়।... যদি বলা হয় যে, কোন কোন প্রবীণ-জিন্নদের উল্লেখ করেছেন তাহলে এর উত্তর হল, এগুলো আধ্যাত্মিক বিভিন্ন দৃশ্য আর সাধারণ দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে এমন বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। তারা কাশফ বা দিব্যদর্শনে বিভিন্ন বিষয় দেখেছেন আর সাধারণের মধ্যে জিন্নের বিশ্বাস ছিল আর পবিত্র কুরআনেও জিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাই তারা উপমারূপী সত্তাকে আসল সত্তা জ্ঞান করে বসেছে।

এ সম্পর্কে আমার নিজের ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা হল, বিভিন্ন সময়ে মানুষজন আমাকে এমন চিঠিপত্র লিখেছে যে, জিন্নরা তাদের বাড়িতে আসে এবং নৈরাজ্য বাঁধায়। আমি সর্বদা নিজের খরচে সেই বাড়ি পরিদর্শন করতে চেয়েছি কিন্তু সর্বদা হয় এই উত্তরই পেয়েছি যে, এখন তাদের আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। অথবা আপনার পত্র আসার কিংবা আপনার প্রতিনিধির আগমনের কল্যাণে সে পালিয়ে গেছে। আমার নিজের ধারণা হল, সেসব মানুষ যা কিছু দেখেছে (তা) তাদের স্নায়বিক ব্যাধি ছিল। আমার চিঠি কিংবা দূতের মাধ্যমে যেহেতু তারা আশ্বস্ত হয়েছে তাই সেই অবস্থা বদলে গেছে।

এই তফসীরের পাঠকদের মধ্যে কোন ভদ্রমহোদয়ের যদি এই সৃষ্টি সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা থাকে আর তিনি আমাকে লিখেন তাহলে আমি এখনও নিজের খরচে সেটি যাচাই করতে প্রস্তুত আছি। নতুবা অগণিত কুরআনের দলিলের আলোকে আমি যা কিছু বুঝেছি তা হল, আম জনতার মধ্যে জিনের যে পরিচিতি আছে এবং জিন্ন সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তা মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাদেরকে বিভিন্ন বস্তু এনে দেয়। এটি কেবলমাত্র ধারণা ও বিভ্রম। অথবা সাপুড়েদের তামাশা বা খেলা। জিন্ন সম্পর্কিত আভ্যন্তরীণ রহস্য না জানার কারণে মানুষজন একে (ক্রীড়া-কৌতুককে) জিন্নদের প্রতি আরোপ করে। জ্ঞানের এই শাখা সম্পর্কেও আমি অধ্যয়ন করেছি আর এসব কৌশল প্রদর্শনকারীদের অথবা জাদুকরদের অনেক গোমর আমি জানি।"

(তফসীরে কবীর, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৯-৭০) এছাড়া হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর মজলিসে ইরফান এবং বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে জিন্নদের সম্পর্কে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সর্বদা এই মতবাদই বর্ণনা করেছেন যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কোথাও এমন জিন্নদের উল্লেখ পাওয়া যায় না যা মৌলভীদের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত জিন্ন। আর যারা তাদের নির্দেশে রাতারাতি কোন মানুষকে তুলে এনে তাদের সামনে উপস্থিত করে। অতএব, হুযূর তাঁর যুগান্তকারী রচনা Revelation, Rationality, Knowledge & Truth (অর্থাৎ, ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য) পুস্তকে বলেন,

"এবার আমরা বিজ্ঞানের আলোকে প্রাচীন কল্প-কাহিনিতে বর্ণিত 'জিন্ন'-এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে যাচাই করবো।... জিন্ন শব্দটি কোন গোপন, অদৃশ্য, বিচ্ছিন্ন এবং দূরবর্তী কোন বস্তুর প্রমাণ বহন করে। এতে গভীর এবং ঘন ছায়ার অর্থও পাওয়া যায়। এ কারণেই পবিত্র কুরআন 'জান্নাতুন' শব্দটিকে (যা এই ধাতু থেকেই উৎপন্ন) জান্নাতের জন্য ব্যবহার করেছে। যা এমন ঘন বাগান সমৃদ্ধ যার ছায়া খুবই ঘন ও গভীর। সাপের জন্যও জিন্ন শব্দটি প্রযোজ্য, যারা প্রকৃতিগতভাবে গোপন ও লুকিয়ে থাকা পছন্দ করে। একারণেই তারা বিচ্ছিন্ন খাল-বিল এবং পাহাড় ও জঙ্গালের গর্তগুলোকে নিজেদের থাকার জন্য বেছে নেয়। পর্দানশিন নারীদের জন্যও জিন্ন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর এমন নেতা ও বড়লোকদের জন্যও ব্যবহৃত হয়, যারা সাধারণ মানুষ থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে। এছাড়া দূরদূরান্তের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজনের ক্ষেত্রেও জিন্ন শব্দটি প্রযোজ্য হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য এবং গোপন প্রত্যেক বস্তুর জন্য জিন্ন শব্দটি প্রযোজ্য হয়।

ওপরে বর্ণিত জিন্ন শব্দের মর্ম ও অর্থ মহানবী (সা.)-এর এই হাদীসের সাথে হুবহু সংগতিপূর্ণ। যাতে তিনি (সা.) লোকদেরকে শুকনো গোবর এবং হাড়গোড় দিয়ে শৌচকর্ম করতে বারণ করেছেন, কেননা এগুলো জিন্নদের খাদ্য। যেভাবে বর্তমানে নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য টিস্যু পেপার ব্যবহার করা হয়, একইভাবে অতীতকালে মানুষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য মাটির শুকনো ঢিলা, পাথর এবং নিকটে থাকা শুকনো জিনিস ব্যবহার করতেন। কাজেই, আমরা খুব সহজেই এই ফলাফল নির্ণয় করতে পারি যে, মহানবী (সা.) এই হাদীসে যে জিন্নের উল্লেখ করেছেন তদ্বারা কোন অদৃশ্য প্রাণীই বুঝিয়েছেন, যাদের জীবন নির্ভর করে হাড়গোড় এবং বর্জ্য ইত্যাদির ওপর। স্মরণ থাকে যেন, তখনকার বিশ্বে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের কোন বিশ্বাসই প্রচলিত ছিল না আর কোন মানুষ এমন ধরনের অদৃশ্য ও আণুবিক্ষনিক প্রাণীর কথা চিন্তাও করতে পারতো না। বিস্ময়ের বিষয় হল, যে-সব সৃষ্টির প্রতি মহানবী (সা.) ইঙ্গিত করেছেন, আরবী ভাষায় এর জন্য জিন্ন বৈ উত্তম আর কোন শব্দ নেই।"

(ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য, পৃ. ৩১১-৩১২)

জিন্ন সম্পর্কে ইসলামের মতবাদ কী? পবিত্র কুরআন অথবা হাদীস থেকে এর কি প্রমাণ পাওয়া যায় অথবা মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে কি যা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, জিন্নদেরও অস্তিত্ব আছে কিংবা যেভাবে বর্তমান যুগের লোকজনের বিশ্বাস বা ধারণা রয়েছে যে, জিন্ন মানুষের ভেতরে ঢুকে যায়, এটি কি সঠিক? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (রাহে.) বলেন,

"জিন্নদের সম্পর্কে আমি অনেক বলেছি। জিন্ন তো এমন এক বিপদ যে পিছুই ছাড়ে না। যে সমাবেশে যাই, যে দেশেই যাই না কেন জিন্ন (সম্পর্কে প্রশ্ন) আসবেই আসবে। অর্থাৎ, জিন্ন সম্পর্কে প্রশ্ন আসে। অনেকবার বলেছি, খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমাগুলোতেও জিন্ন আসতো। আনসারুল্লাহ্র (ইজতেমায়ও জিন্ন) পিছু ছাড়ে নি। এখনও যখন করাচী যাই সেখানে (জিন্ন সম্পর্কে) প্রশ্ন করা হয়। পিন্ডী গেলে সেখানেও (এই) প্রশ্ন আসে। ইংল্যান্ডে, ইউরোপের সর্বত্র জিন্নদের বিষয়ে পাকিস্তানীদের গভীর আগ্রহ রয়েছে।

জিন্ন শব্দটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে জিন্ন বলতে আরবী ভাষায় লুকোনো বা গুপ্ত জিনিসকে বোঝায়। অর্থাৎ আরবীতে জিন্ন শব্দটি সেসব জিনিসের বেলায় প্রযোজ্য যা কোন না কোন ভাবে লুকোনো বা গুপ্ত থাকে। একারণেই সাপকেও 'জিন্ন' বা 'জান্ন' বলা হয় এবং পর্দানশিন নারীদেরকেও জিন্ন বলা হয়। বড়লোক, যারা সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক থাকে, আড়ালে থাকে-তাদেরকেও জিন্ন বলা হয়। পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠী, যারা সাধারণত চষধরহবা সমতল ভূমিতে বসবাসকারী লোকদের থেকে, সাধারণ মানুষজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, লুকিয়ে থাকে-তাদেরকে জিন্ন বলা হয়। গুহায় বসবাসকারী লোকদেরকেও জিন্ন বলা হয়। কষ্টসহিষ্ণু ও কঠোর পরিশ্রমীদের জন্যও জিন্ন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। Bacteria-র জন্যও জিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই মহানবী (সা.) হাড়গোড় দিয়ে শৌচকর্ম করতে বারণ করেছেন, কেননা এগুলো জিন্নের খাদ্য। অতীতকালে Bacteria-র কোন ধারণা ছিল না আর এটিও জানা ছিল না যে, এগুলো কারও খোরাক। কিন্তু পরবর্তী যুগে

গবেষণার আলোকে জানা গেছে যে, সত্যিকার অর্থেই হাড়ের সাথে Bacteria জড়িয়ে থাকে এবং তা ক্ষতিকর, তাই এদ্বারা শৌচকর্ম করা উচিত নয়। অতএব, জিন্নের একটি অর্থ হল, গোপন থাকা। মূলত এগুলোই জিন্ন শব্দের সার্বজনীন অর্থ। আরেকটি অর্থ হল, আগুন থেকে সৃষ্ট। যাদের মধ্যে অগ্নিস্বভাব পাওয়া যায়, যার মাঝে বিদ্রোহী চেতনা পাওয়া যায়, প্রত্যেক সেই জাতি যারা অগ্নিপ্রিয়, যারা অস্থির, যাদের দ্রুত রাগ ধরে, ক্ষিপ্ত, ঝগড়াটে, বিদ্রোহী– এদের সবাইকে জিন্ন বলা হয়। যে-সব জিন্নকে হযরত সুলায়মান এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর অনুগত দাস বানানো হয়েছিল, তারা এমন জাতি ছিল যাদেরকে জয় করা হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কষ্টসহিষ্ণু অভ্যাসও ছিল আর বিদ্রোহের উপকরণও ছিল। কাজেই, পবিত্র কুরআন বলে, তাদেরকে শিকলাবদ্ধ করা হয়েছিল আর তাদেরকে দিয়ে Forced Labourবা জোর করে (শ্রমিকের) কাজ করানো হতো। তারা যদি এমন জিন্ন হতো, যেমনটি মৌলভীদের মন-মস্তিষ্কে বিরাজমান– তাহলে তাদেরকে তো শিকলাবদ্ধ করা যেত না। (এথেকে) স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, সেসব জিন্ন ছিল জাগতিক সৃষ্টি বা বস্তুগত সৃষ্টি। যেমন, বড় মানুষ এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্যও পবিত্র কুরআন জিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছে। শীর্ষ পর্যায়ের মানুষ তারা পুঁজিবাদী হোক কিংবা গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিনিধি হোক, তাদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা সূরা রহমানে বলেন,

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ
اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿۳۴﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۵﴾

(সূরা আর রহমান: ৩৪-৩৫)

হে জিন্নদের মধ্য হতে শীর্ষ পর্যায়ের মানুষ, এবং হে সাধারণ লোকদের মধ্য হতে শীর্ষ পর্যায়ের মানুষ। এখানে এই আয়াতের অর্থ মূলত এটি। অতএব, জিন্ন শব্দটি এসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, এই শব্দটি অনেক ব্যাপক অর্থ বহন করে। মহানবী (সা.)-এর সাথেও পাহাড়ি অঞ্চলের কিছু মানুষ, কঠোর পরিশ্রমী জাতির প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করতে আসে, তারা চাচ্ছিল তাদের সাথে যেন পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়। অতএব, মহানবী (সা.) তাদের সাথে বাইরে বসার জন্য সময় নির্ধারণ করেন, যেখানে তারা শিবির স্থাপন করেছিল। তিনি (সা.) তাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সেখানে যান এবং আলোচনা হয়। পবিত্র কুরআন এর উল্লেখ করেছে এবং সূরা জিন্ন-এ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর তারা ঈমানও এনেছিলেন। একইসাথে বিভিন্ন হাদীস থেকেও জানা যায় যে, পরবর্তীতে সাহাবীরা যখন সেখানে যান তখন দেখেন যে, সেখানে তাদের চুলার চিহ্ন রয়েছে, যেখানে খাবার রান্না করা হতো। (তাহলে) তারা কীভাবে জিন্ন হতে পারে? মৌলভীরা যে জিন্ন-এ বিশ্বাস করে তারা তো আগুন দিয়ে খাবার রান্না করে না, তাদের খাদ্যই তো অন্য জিনিস, আগুন জাতীয় বস্তু কিংবা বাতাস। কাজেই, সুস্পষ্টভাবে জানা গেল, যে জিন্ন মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল তারা মানুষের শ্রেণিভুক্ত ছিল। এছাড়া

সেখানে নবী-রসূলদের (আগমনেরও) ধারণা পাওয়া যায়। তারা বলে যে, আমরা খুবই অজ্ঞ ছিলাম। আমরা মনে করতাম, খোদা এখন আর কোন নবী প্রেরণ করবেন না। কিন্তু দেখো! এরপরও নবী এসেছে। নবী-রসূলরা তো মানুষের জন্য আসেন। পবিত্র কুরআনে সর্বদা মানুষজনকে সম্বোধন করে বাণী পৌঁছানোর আদেশ দিয়েছে। জিন্নদের সম্বোধন করে কোথাও বলে নি। এজন্য তারা যারা ঈমান এনেছিল তারা উল্লেখ করে যে, আমরা নবীদের (আগমনকে) অস্বীকার করেছিলাম যে, ভবিষ্যতে আর কোন নবী আসবেন না। (এথেকে) স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, তারা মানুষজনের শ্রেণিভুক্ত কিছু মানুষ ছিল। পবিত্র কুরআন তো এসব অর্থে, এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থে– যা আমি বিভিন্ন স্থানে জিন্নদের উল্লেখ করে বর্ণনা করেছি। কিন্তু এমন জিন্ন এর উল্লেখ করেন নি, যারা মানুষের মুরগী চুরি করে এনে মৌলভী সাহেবকে দেয়। অথবা আপনার আকাঙ্ক্ষা জন্মাবে যে, অমুক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসো তখন জিন্ন রাতারাতি তাকে ধরে নিয়ে আসবে। এমন কোন কথা পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায় না অথবা মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতেও পাওয়া যায় না।

(মজলিসে সওয়াল জওয়াব, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৪) হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও জিন্নদের সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার প্রবন্ধাবলি রচনা করেছেন। অতএব, একস্থানে তিনি (রা.) লিখেছেন,

"জিন্ন শব্দ দ্বারা অনেক জিনিস বুঝাতে পারে কিন্তু এটি কোনভাবেই সঠিক নয় যে, পৃথিবীতে এমন কোন জিন্নও পাওয়া যায় যারা হয়ত মানুষজনের জন্য স্বয়ং খেলনায় পরিণত হয় অথবা লোকদেরকে কাবু করে তাদেরকে নিজের ক্রীড়নকে পরিণত করে কিংবা কোন কোন মানুষের বন্ধু সেজে তাদেরকে ভাল ভাল জিনিস এনে দেয় আবার অনেকের শত্রু হয়ে তাদেরকে বিরক্ত করে। অথবা কোন কোন মানুষের মাথায় ভর করে তাদেরকে উন্মাদনা এবং রোগব্যাধিতে আক্রান্ত করে দেয় আবার কারও কারও জন্য সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব দুর্বল মস্তিষ্কের মানুষজনের কুসংস্কার, ইসলামে যার কোন সদন বা দলিল পাওয়া যায় না। আর সত্যিকার মুসলমানদের এসব কুসংস্কার পরিহার করা উচিত।

তবে আভিধানিক অর্থের নিরিখে (পরিভাষাগতভাবে নয়) লুকোনো সৃষ্টি হিসেবে ফেরেশতাদেরকেও জিন্ন বলা যেতে পারে। আর এ বিষয়টি ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রমাণিত যে, ফেরেশতারা মু'মিনদের জ্ঞান বৃদ্ধির ও তাদের জ্ঞানের শক্তির বিকাশ ঘটানোর এবং কাফিরদের মোকাবিলায় তাদেরকে জয়যুক্ত করানোর ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করে। যেমনটি বদরের প্রান্তরে হয়েছিল। যখন তিনশ' তেরজন অসহায় ও নিরালম্ব মুসলমান এক হাজার যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধংদেহি কাফিরদেরকে খোদার নির্দেশের আলোকে চোখের নিমিষে মাটিয়ে মিশিয়ে দিয়েছিল, (সহীহ্ বুখারী)। প্রশ্নকারী বন্ধু যদি লুকোনো আত্মার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা রাখে তাহলে তিনি যেন ক্রীড়নকে পরিণত হওয়ার কিংবা খেল-তামাশা সৃষ্টিকারী জিন্নদের ধারণা বা বিশ্বাস পরিহার করেন এবং ফেরেশতাদের সাধে বন্ধুত্ব গড়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, যাদের সাথে সম্পর্ক হলে খোদার কৃপায় মানুষের কায়া পাল্টে যায়।"

(আল্ ফযল, ১৩ই জুন, ১৯৫০)

অনুরূপভাবে 'হায়াতে কুদসীতে' হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত বিভিন্ন এমন ধরনের ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন,

"কারও দুষ্ট আত্মার খপ্পরে পড়ার বা জাদুগ্রস্ত হওয়ার যতটুকু প্রশ্ন, এক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিভঙ্গি হল, এটি এক প্রকার হিস্টিরিয়া রোগ। যেক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তি নিজের অজান্তে অর্থাৎ অবচেতন মনে স্বয়ং নিজেকে অসুস্থ অথবা কোন অদৃশ্য আত্মার দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করে আর এই অবস্থায় সেই ব্যক্তির অতীত জীবনের বিভিন্ন অবস্থা এবং তার কামনাবাসনা ও তার বিপদাপদ অচেতনভাবে (তার ওপর) ভর করে। এটিও এক প্রকার ব্যাধি কিন্তু এটি রোগের অনুভূতি মাত্র, সত্যিকার ব্যাধি নয়। ইসলাম ফেরেশতা এবং জিন্নের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে আর পবিত্র কুরআনেও এর উল্লেখ রয়েছে আর এটিও সঠিক যে, আল্লাহ্ তা'লার ফেরেশতারা তাঁর নির্দেশের অধীনে বিশ্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন এবং মানুষের হৃদয়জগতে পুণ্যকর্মের প্রেরণা সঞ্চার করেন আর পাপের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। কিন্তু এটি সঠিক নয় এবং শরীয়তের আলোকে এর কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না যে, জিন্নরা মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাদের মন-মস্তিষ্কে ভর করে মানুষকে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম করায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী শিক্ষা এবং মানুষের বিবেকের স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। এছাড়া ইসলাম জিন্নের মর্মার্থ এত ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেছে যে, এতে কোন কোন বিশেষ লুকোনো প্রাণী ছাড়াও অদৃশ্য ক্ষুদ্র পোকামাকড় এবং সূক্ষ্ম জীবাণুও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নিজেদের পানাহার পাত্রগুলোকে ঢেকে রাখো নতুবা এর মধ্যে জিন্ন প্রবেশ করবে। এর অর্থও এটিই যে, রোগের জীবাণু থেকে নিজেদের পানাহারের দ্রব্যাদিকে সুরক্ষিত রাখো।

যাহোক, জিন্নদের অস্তিত্ব প্রমাণিত বিষয়। আর খোদা তা'লার ব্যবস্থাপনায় বাস্তবতা অবশ্যই আছে কিন্তু ক্রীড়া-কৌতুকের (স্থান) নেই। তাই এর বিরুদ্ধে দৃশ্যত বিভ্রান্তিকর ও প্রতারণামূলক যুক্তি থাকা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি না যে, এমনও কোন জিন্ন আছে, যারা মানুষকে নিজেদের ক্রীড়া-কৌতুকের লক্ষ্যে পরিণত করে। কাজেই, আমার মতে যে জিনিসকে দুষ্ট আত্মার (প্রভাব) বা জাদু বলা হয় তা মূলত হিস্টিরিয়া রোগ। আর যে জিনিসকে ভূতপ্রেত কিংবা জাদুর প্রভাব বলা হয় তা মূলত নামধারী দুষ্ট আত্মার কিংবা জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই নিজের অস্তিত্বের অপর দিক, আর যা অবচেতন মনে জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির মুখ থেকেই নিঃসৃত। যেহেতু আক্রান্ত ব্যক্তি দুর্বল হৃদয়ের অধিকারী তাই যখনই কোন অধিক দৃঢ়চেতা মানুষ অথবা অধিক আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি তার প্রতি স্বীয় মনোযোগ নিবদ্ধ করে তখন নিজের মন-মস্তিষ্ক ও আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে সে আক্রান্ত ব্যক্তির ভ্রম দূর করে দেয়। পার্থিব লোকেরা শুধুমাত্র মনের জোর খাটিয়ে এই পরিবর্তন সৃষ্টি করে কিন্তু আধ্যাত্মিক লোকদের অনুশীলনে মনোজগৎ এবং দোয়ার প্রভাবও অন্তর্ভুক্ত থাকে আর মনোযোগ নিবদ্ধ করার যে বিদ্যা তা অবশ্যই সত্য।"

[হযরত মাওলানা গোলাম রসূল সাহেব রাজেকী (রা.) প্রণীত হায়াতে কুদসী পুস্তক, ৬১৭-৬১৮]

বাকী থাকলো তারেক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বর্ণিত বিষয়াদি, (সেটি) একটি শ্রুত ঘটনানির্ভর। এক্ষেত্রে শ্রবণকারীরও ভুল হতে পারে। কেননা, আমার যতটুকু মনে পড়ে, হুযূর (রাহে.) কোথাও একথা বলেন নি যে, তিনি কোন জিন্নকে ব্লেড লাগাতে দেখেছিলেন বরং তিনি বলেছেন, পরের দিন সকালে দেখি যে, ব্লেড লাগিয়ে রাখা ছিল। এরপর হুযূর (রাহে.) এ সম্পর্কে সেই রাতের যে ঘটনা তা বর্ণনা করেছেন। হতে পারে, সেটি কোন কাশফী দৃশ্য বা দিব্যদর্শন ছিল। কেননা, হুযূর (রাহে.)-এর নিজের রচনাবলি এবং বিভিন্ন মজলিসে ইরফানে জিন্ন সম্পর্কে বর্ণিত তাঁর মতবাদ এ ধরনের জিন্নের অস্তিত্বের পরিপন্থি।

অতএব, জিন্ন শব্দ দ্বারা অনেক কিছু বুঝাতে পারে কিন্তু এটি যথার্থ নয় যে, পৃথিবীতে এমন কোন জিন্নও পাওয়া যায়

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 29 Feb, 2024 Issue No.9

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তোমরা এমন কাজ কেন কর–ইত্যাদি ইত্যাদি বলে বকাঝকা করে। এতে সেই যুবকের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। সে বলে, আমাকে লোকের সামনে অপমান করল, আমি তার কথা মানব না। কোন কর্মকর্তা এই কাজ করলে সে তখন মসজিদ আসাই বন্ধ করে দেয়। তাই এসব কাজ দূরে সরিয়ে দেওয়া আর অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ। তাই যদি বোঝাতেই হয়, তবে সবসময় সদিচ্ছা সহকারে বোঝানো উচিত, মানুষ যেভাবে নিজের সন্তানকে পৃথক নিয়ে গিয়ে বোঝায় যে, এটা খারাপ কথা। মানুষ সচরাচর নিজের সন্তানের বিষয়টা মাথায় রাখে। অনেকে আবার লোকের সামনে ছোটদেরও ভীষণ বকাঝকা করে, এমনকি নিজেদের বাচ্চাদেরও। কিন্তু নিজের সন্তানের প্রতি আচরণ কিছুটা হলেও পৃথক হয়ে থাকে। এটা অন্যায়। যদি কোন যুবককে বোঝাতে হয় তবে বড়দেরও উচিত সেই যুবকের আত্মসম্মানের প্রতি সংবেদনশীল থেকে তাকে বোঝানো। আর যদি ছোটরা বড়দের সঙ্গে কথা বলে তবে তাদেরও উচিত শিষ্টাচার বজায় রেখে বড়দের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি যত্নবান থাকা, অজ্ঞদের ন্যায় সামনের জনের কথা না শুনে মুখে যা আসে তাই বলে ফেলা উচিত নয়। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, এটা উন্নত নৈতিকতার ভিত্তি। নম্রতা সহকারে একে অপরের প্রতি উন্নত আচরণ করা উচিত, বেদুইন ও অজ্ঞদের ন্যায় মুখে যা আসে তাই বলে ফেলা উচিত নয়।

ওয়াকফাতে নওদের প্রশ্ন:

প্রশ্ন: আমাদের স্কুলের সহপাঠীদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা তাদের সঙ্গে কোন সীমা পর্যন্ত সখ্যতা গড়ে তুলতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাদের সংস্কৃতি আমাদের থেকে পৃথক। স্কুলে আপনারা একই ইউনিফর্মে থাকে, তাই পোশাকের দিক থেকে প্রায় একই। বাকি থাকল তাদের ধর্ম যার সঙ্গে তাদের কোন আগ্রহ থাকে না। তাই আপনারা তাদেরকে বলবেন, আমি একজন আহমদী মুসলমান।' আর আহমদী মুসলমান কাদের বলে? উন্নত আচরণ প্রদর্শন কর,তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, দেখবে তারা নিজেরাই তোমাদের পরিচয় জানতে চাইবে। এরপর যখন তারা তোমাদের বাড়ি এসে দেখা করতে চাইবে তখন তারা বাড়িতে এসেও দেখা করতে পারে। তোমরা লোকের বাড়ি যাবে না, রাত্রিযাপন করবে না। ছেলে বা মেয়ে কেউই যেন বাড়ি থেকে বাইরে কোথাও রাত্রিবাস না করে। কেউ যদি তোমাদের আমন্ত্রিত করে তবে এক–দুই ঘন্টার জন্য চলে যেও, কিন্তু সেখানে গিয়ে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, তোমাদের তাদের সঙ্গে উন্নত আচরণ প্রদর্শন করবে, খেলতে খেলতে যদি নামাযের সময় হয়ে যায় তবে বলে দিবে যে, নামাযের সময় হয়েছে, আমাকে নামায পড়ার জন্য জায়গা দেখিয়ে দাও যেখানে আমি নামায পড়তে পারি। এর ফলে তাদের উপর ভাল প্রভাব পড়বে। তারা তোমাদের বাড়িতে আসে, খেলা করে, আর খেলার সময় যদি তাদেরও নামাযের সময় হয়ে যায় তবে বলে দাও। তাদের সঙ্গে ভাল কথা বল। কেউ অপছন্দনীয় কিছু বললে তাকে বলে দাও এগুলো তোমার পছন্দ নয়, আমাদের ভাল কথা বলা উচিত। জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এমন কথা বলা উচিত। তাই প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা সংস্কৃতি রয়েছে। কিন্তু আমরা এভাবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলব, তাদের সঙ্গে নিজেদের উন্নত নৈতিক আচরণ প্রদর্শন করব আর এতে তারা আহমদীয়াতের কাছাকাছি আসবে এবং আহমদীয়াতের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবে। এর ফলে তবলীগের পথও খুলে যাবে। অনেক ছোট ছোট বাচ্চাও নিজেদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তার মাধ্যমে বন্ধু–বান্ধবের মাঝে তবলীগ শুরু করে দেয়, সমবয়সীদের সঙ্গে তবলীগের ফলে অনেক সময় বান্ধবীর কথা শুনে পনেরো ষোলো বছরের অনেক মেয়ে আহমদীও হয়ে যায়। অতএব,তাদের সংস্কৃতি ভিন্ন বলেই তাদের থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত নয়। আপনারা তাদের দেশে বসবাস করছেন,তাদের অনেক কিছু ভালও আছে, যেগুলি গ্রহণ করতে কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু যেগুলো তাদের ভুল কাজ সেগুলো গ্রহণ করবেন না।

প্রশ্ন: তবলীগের সময় আমরা যখন বলি যে, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম, তখন তারা বলে, যদি একথা সঠিক হয় তবে এই কথাগুলো আমাদের না বলে মুসলমান দেশে গিয়ে বল। আমরা তো প্রথম থেকেই শান্তিপ্রিয় মানুষ। হুযুর এ বিষয়ে পথপ্রদর্শন করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কথাটা তারা ঠিকই বলে। তাদেরকে বলবে, তোমাদের কথা সঠিক আর আমাদের এটাই করা উচিত। আমরা চেষ্টা করি যতদূর সম্ভব তাদেরকে একথা বলার। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে এজন্য কথা বলছি যে, যদি তোমাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে, যদি তোমরা মনে কর যে ইসলাম শান্তিপূর্ণ ধর্ম নয়, তাই একথা তোমাদেরকে বলি যাতে তোমাদের সেই সংশয় দূর হয়ে যায়। তোমাদেরকে ইসলামের অনুরাগী হওয়ার জন্য একথা বলছি না। ইসলাম গ্রহণ করা বা ধর্ম পরিবর্তন করা প্রত্যেকের নিজের অন্তরের বিষয়। আপনাদের রীতি–নীতি উন্নত থাকলে তারা নিজেরাই আপনাদের কাছে আসবে। তাদেরকে বলুন, আমরা কেবল এতটুকু বলতে চাই যে, যেহেতু তোমাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সংশয় রয়েছে, তোমরা মনে কর যে ইসলাম খুব খারাপ ধর্ম আর চরমপন্থী ধর্ম আর অত্যাচারী ধর্ম, তাই আমরা তোমাদের জানাতে চাইছি যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এমনটি নয়। এছাড়া তোমাদেরকে মুসলমান বানানোর আমাদের কোনও উদ্দেশ্য নেই। আর এভাবে কাউকে মুসলমান হওয়ার জন্য বলাও উচিত নয়। আপনি যখন স্থায়ীভাবে তার সঙ্গে কথা বলবেন আর তার আপনাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবে তখন তারা এমনিতেই আপনার কাছাকাছি চলে আসবে এবং আপনাদের বন্ধু হয়ে উঠবে। তখন আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম আহমদীয়াতের পক্ষে কারো হৃদয় পরিবর্তন করার হলে তিনি নিজেই তার হৃদয় পরিবর্তন করে দিবেন। আপনারা যদি সরাসরি গিয়ে বলেন, ইসলাম শান্তিপূর্ণ ধর্ম, একে গ্রহণ কর, তবে তারা বলবে, প্রথমে নিজেদের সংশোধন কর, আমাদেরকে কি বোঝাতে আসছ?

প্রশ্ন: কলেজে কিছু বান্ধবীদের সঙ্গে যখন আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে আলোচনা হয়,তখন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, যখন আমাদের কাছে একটা উন্নত ও শান্তিপূর্ণ দেশ আছে, ভাল বাড়িঘরও আছে, সেক্ষেত্রে আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লাকে মান্য করি তবে আর কি অতিরিক্ত পাব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাদেরকে বলা উচিত যে, এই জগত নশ্বর, আর মানুষও এখান থেকে চলে যাবে। আমাদের বিশ্বাস, ইসলাম এই অবধারণা পেশ করে যে, এর পরও এক জগত আছে। আল্লাহ্ তা'লাকে মান্য করলে তাঁর অধিকার আমরা প্রদান করব আর এতে আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন। এর ফলে মৃত্যুর পর তিনি আমাদেরকে এর প্রতিদান দেন। এই জগত তো অস্থায়ী। স্থায়ী জগত এর পর শুরু হয়।

(ক্রমশ...)

১১ পাতার পর.....

যারা মানুষজনের জন্য খেলনায় পরিণত হয় অথবা লোকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে নিজের ক্রীড়নকে পরিণত করে। অথবা তারা কিছু মানুষের বন্ধু সেজে তাদেরকে মণ্ডা–মিঠাই এনে দেয় আবার কারও শত্রু হয়ে তাদের মাথায় ভর করে এবং তাদের শরীরে প্রবেশ করে তাদেরকে বিরক্ত করতে থাকে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মৌলভীদের আবিষ্কার, যা দুর্বল ঈমান এবং সন্দেহের বাতিক আছে এমন লোকদেরকে নিজেদের ক্রীড়নকে পরিণত করে তাদের দিয়ে স্বার্থোদ্ধার করে। ইসলামে এমন জিন্নদের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর প্রকৃত মুসলমানদের এমন ধরনের কুসংস্কার এড়িয়ে চলা উচিত।

যদি এমন কোন জিন্ন থাকতো তাহলে আমাদের মনিব ও অভিভাবক হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সেই মহান সত্তা ছিলেন, সেসব জিন্নের অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করা এবং তাঁর শত্রুদের মাথায় ভর করে তাদেরকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করা উচিত ছিল। বিশেষভাবে যেখানে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তাঁর প্রতি এক ধরনের জিন্নের ঈমান আনারও উল্লেখ বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই, বাস্তবে এমনটি না হওয়া প্রমাণ করে যে, এই জগতে সেই কল্পিত জিন্নের কোন অস্তিত্ব নেই।

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir